একদিন জ্যোৎস্নাভাঙা রাতে

সুমন্ত আসলাম

SUPERIOR SUNY

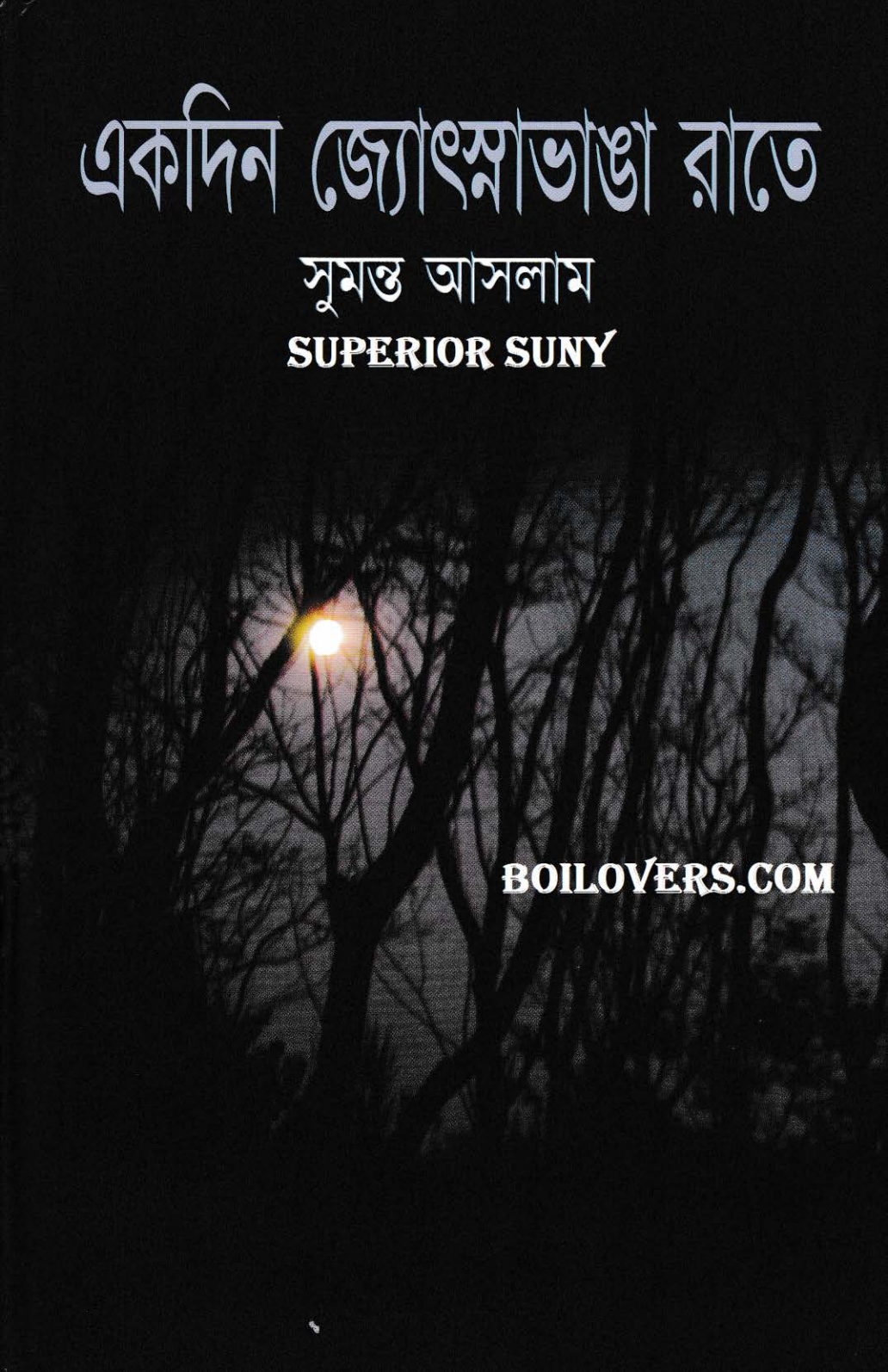

BOILOVERS.COM

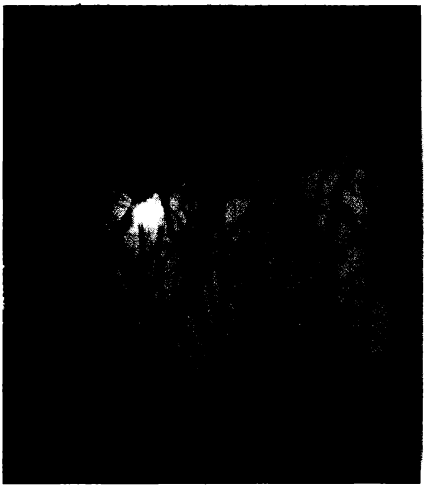

লোপার একটাই শখ— প্রতিদিন সে মজার মজার গল্প শুনবে। তাই সে তার বড়লোক বাবার সবকিছু ছেড়ে প্রতিদিন চলে আসে একটা ব্যাচেলর রুমে, যেখানে তার বন্ধু মৃদুল, রোহিত, জাহিদ, শোয়েব ও রেজা থাকে। মধ্যবিত্ত এই যুবকদের রুমে সে কেবল একটা জিনিসই চায়, তা হলো— মজার মজার গল্প।

লোপার বন্ধুরা প্রতিদিনই তাকে মজার মজার গল্প শোনাতে চেষ্টা করে। লোপা প্রতিদিন তা শোনে এবং প্রতিদিন হাসে। কিন্তু একসময় তার আর কোনো কিছুতে হাসি পায় না।

তবু সে তার বন্ধুদের কাছে আসে।

একদিন হঠাৎ, হঠাৎ এক রাতে লোপা চলে আসে তার বন্ধুদের রুমে এবং এসেই বলে, 'আজ আমি তোদের একটা মজার গল্প শোনাব।'

গল্প বলা শুরু করে লোপা, বন্ধুরা অবাক হয়ে তার সে গল্প শোনে। এরকম গল্প তারা কোনোদিন শোনে নি, এরকম ভয়ঙ্কর গল্প তারা কোনোদিনই শোনে নি।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :: মাসুম রহমান

একদিন জ্যোৎস্নাভাঙা রাতে

সুমন্ত আসলাম

অন্যপ্রকাশ

চতুর্থ মুদ্রণ | মে ২০০৫
তৃতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৫
প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৫

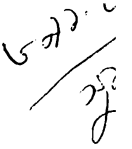

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ৭৫ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Ekdin Josnabhanga Rate | By Sumanto Aslam
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 75.00 only
ISBN : 984 868 327 5

মাঝে মাঝে আমার কাছে অচেনা কিছু মানুষ আসে। তারা কিছু বলতে চায় আমাকে। কেউ কেউ বলে, কেউ কেউ চুপচাপ বসে থাকে, বলে না কিছু।

একদিন একটা মেয়ে এলো। কালো মতো দেখতে, কিন্তু অপূর্ব মিষ্টি তার চেহারা। চুপচাপ বসে আছে সে। সাধারণত চুপচাপ বসে থাকলে আমি আর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি না। সেদিন করলাম। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে মেয়েটা একটা গল্প বলল আমাকে— তার জীবনের গল্প। গল্পটা শুনতে শুনতে গাটা শিউরে উঠল আমার।

মাথায় অনেক যন্ত্রণা নিয়ে বেশ কয়েকদিন পর সে গল্পটা আমি এক বুদ্ধিমতী মানুষকে বললাম, যদি মাথাটা হালকা হয়। কিন্তু হায়! গল্পটা শুনে তিনিও বললেন, 'সুমন্ত, তোমার গল্প শুনে গা শিউরে উঠেছে আমার।'

প্রিয় সুমনা শারমীন, প্রিয় সুমী আপা

মেয়েদের অনেক জটিল গল্প, জটিল সমস্যা আপনি জেনে যান প্রতিদিন। তাদের অনেক অব্যক্ত কষ্টের কথা বলে দেন আপনার সম্পাদিত পাতায়। তারপরও আপনি একটা মেয়ের গল্প শুনে শিউরে উঠলেন!

আপা, সে গল্পটা নিয়েই এ উপন্যাসটা লিখেছি আমি। আচ্ছা আপা, আপনি কি বলবেন— এ রকম শিউরে ওঠা ঘটনা এ দেশে প্রতিদিন কতবার ঘটে ?

পুরো ব্যাপারটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনে হলো মৃদুলের। মেয়েটি তাকে দেখে শুধু চমকেই ওঠেনি, ভয় পেয়ে কিছুটা চিৎকার করেও উঠেছে। পরে চোখ দুটো চারদিকে প্রসারিত করে এমনভাবে তাকিয়েছে, যেন সে মঙ্গল গ্রহের আজব কোনো প্রাণী, যার মাথার অধিকাংশ জায়গা দখল করে আছে তার সামঞ্জস্যহীন বড় বড় দুটো চোখ।

তবু মুগ্ধ চোখে তাকাল মৃদুল। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা প্রশান্ত চোখ, বা গালে ছোট্ট একটা প্রাচীন দাগ, সারা মুখে ব্যক্তিত্বের অভিজাত ছায়া, শুধু নাকটাই একটু বোঁচা ধরনের। মেয়েটি কিছু বলার আগেই কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গিতে মৃদুল বলল, 'আমি দুঃখিত, হৃদয়ের ভেতর থেকে দুঃখিত।'

কিছু বলল না মেয়েটি। কেবল মৃদুলকে পাশ কেটে সামনের দিকে পা বাড়াতেই আবার থমকে দাঁড়াল সে। মৃদুল তার সামনে এসে দাঁড়াল এবং দাঁড়িয়েই একটু শব্দ করে আবার বলল, 'আমি দুঃখিত।'

গভীর চোখে মেয়েটি মৃদুলের দিকে তাকাল। তারপর এর চেয়েও গভীর কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে।'

ঠোঁটের কোনায় যে এক টুকরো হাসি ঝুলে ছিল মৃদুলের, হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল এবার। চোখের মণি দুটো আরো চকচক করে উঠল তার, তারপর সে চকচকে চোখ নিয়েই কিছুটা সম্মোহিতের মতো বলল, 'আপনার নাম তো টুসী, না ?'

মেয়েটি আগের মতো ছোট্ট করে উত্তর দিল, 'জি।'

'গুড। আর আমার পরিচিতরা আমাকে ডাকে মৃদুল বলে।'

'কেন ?' প্রশ্নটা করেই কিছুটা রূঢ় চেহারা, কিছুটা রূঢ় স্বর, কিছুটা রূঢ় ভঙ্গিতে টুসী বলল, 'মৃদু লজ্জাহীন বলে ?'

ঠোঁটের কোনায় আগের মতোই হাসিটা ধরে রাখল মৃদুল। ছোট্ট একটা অপমান বুকে এসে ধাক্কা দিলেও আপাতত সেটা বুকের ভেতরে যেতে দিল না সে। কেবল চোখ দুটো একবার নিচের দিকে নিয়ে পুরোপুরি স্বাভাবিকভাবেই বলল, 'না, মৃদুল আমার নাম বলে।'

'আপনার নাম মৃদুল ?' ঠিক জিজ্ঞাসা নয়, তাচ্ছিল্যের একটা হালকা প্রকাশ দেখাল টুসী এবং তার পরপরই কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল।

মৃদুল এটাও টের পেল। ঠোঁট দুটো চেপে হাসি হাসি ভাব করে সে তাচ্ছিল্যকে তুচ্ছ মনে করে এবার একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর টুসীর দিকে একটু মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'জি, মৃদুল। মা-বাবা আকিকা করে এ নামটা রেখেছেন।'

'আপনার আকিকা করা হয়েছে নাকি ?'

'জি।'

'কী দিয়ে করা হয়েছে ?'

'ছাগল দিয়ে।'

'অ...। স্বভাবটা তাই সে রকমই।'

ধাক্কাটা আবার লাগল বুকে, অপমানের ধাক্কা। বুকের সামনে দিয়েই আবার বুকের ভেতর ঢুকতে চেয়েছিল, এমনকি প্রায় ঢুকেও গিয়েছিল। খুব কৌশলে, খুব কষ্ট করে এবারও সেটা ভেতরে যেতে দিল না মৃদুল। কিন্তু ধাক্কাটা বেশ লাল করে দিল তার মুখটা, লাল করে দিল ভেতরটাও। লাল লাল মুখ নিয়েই মৃদুল মৃদু হেসে বলল, 'তাই ?'

টুসী কোনো জবাব দিল না, এমনকি কথাও বলল না। কেবল মৃদুলের চোখের দিকে একবার তাকিয়ে মুখটা আগের মতো গম্ভীর করে রাখল কিছুক্ষণ। তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে আসা ভেজা চুলগুলো নারীকৌশলে পছনে ঠেলে দিয়ে কিছুটা সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং সরাসরি মৃদুলের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'আমি কি এবার জানতে পারি, আপনার উদ্দেশ্যটা আসলে কী ?'

কথাটার জবাব দেয়ার আগে মৃদুল একটু হেসে নিলো। তারপর বলল, 'আপনার কি মনে হয় আমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি ?'

চোখ দুটো সরু করে তাকিয়ে টুসী বলল, 'দুটোই প্রশ্ন হয়ে গেল না ? প্রশ্ন আমিও করেছি, আপনিও করেছেন। তবে আমি আগে করেছি, সুতরাং উত্তরটা আমারই আগে পাওয়া উচিত।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে।'

'তাহলে আমার উত্তরটা দিন।'

'দিতেই হবে ?'

'হ্যাঁ।'

নাকের আগায় আঙুল দিয়ে মৃদু চুলকানোর ভঙ্গি করে মৃদুল বলল, 'একটা কথা বলি ?'

'আপনি তো অনেক কথাই বলছেন।'

'ঠিক। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, আপাতত আপনার প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না।'

'ওকে, আমারও কিছু আর শুনতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু আপনাকে যে শুনতেই হবে!'

টুসী একটু শব্দ করে বলল, 'কেন ?'

'ব্যাপারটা তাহলে কেমন হয়ে যাবে না ?'

কপালের মাঝখানে সামান্য ভাঁজ ফেলে টুসী বলল, 'কেমন হয়ে যাবে ?'

'ব্যাপারটা তাহলে জরুরি আলোচনা সভার মতো হয়ে যাবে, যেখানে কোনো সমাধান না টেনেই আলোচনা শেষ করা হয়।'

শিরদাঁড়া পেছনে ঠেলে একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল টুসী, 'তা আমাকে এখন কী করতে হবে ?'

'করার আছে অনেক কিছু আবার বলতে পারেন, কিছুই করার নেই।'

'কথাটা বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির মতো হয়ে গেল না, যে কথার মাঝে অনেক মানে পাওয়া যাবে মনে হয়, আসলে যা কেবল কথাই, কোনো মানে নেই তাতে।'

'থ্যাংকু।'

'কেন ?'

'আমাকে বুদ্ধিজীবীর কাতারে ফেলে দিলেন বলে।' কাঁধ দুটো একটু উঁচু করে টুসীর দিকে তাকাল মৃদুল, 'নিজেকে অসম্ভব গর্বিত মনে হচ্ছে এখন।'

'খুব বুদ্ধিজীবী হওয়ার ইচ্ছে, না ?'

'মন্দ কী। কেবল কথা বেচেই জীবন চালানো যাবে।'

'নাহ্।' একটু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে টুসী বলল, 'এবার সত্যি করে বলুন তো, আপনি আসলে কী চান ?'

'কথাটা আবার বলতে হচ্ছে— চাওয়ার আছে আসলে অনেক কিছু, আবার বলতে পারেন কিছুই চাওয়ার নেই।'

'এবার তো পুরো একজন রাজনীতিবিদের মতো কথা বললেন— আসলে আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই বলে তিনি ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে কিংবা ক্ষমতায় গিয়ে চৌদ্দগুষ্টির আখের গুছিয়ে নেন কয়েক মাসেই।'

'দুঃখিত, মানুষ থেকে অবোধ কোনো প্রাণী হতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু নিজেকে রাজনীতিবিদ হিসেবে গড়ে তোলার আগেই নিজের মৃত্যু চাই।'

'রাজনীতির ওপর এতো ঘৃণা!'

'রাজনীতির ওপর নয়, রাজনীতিবিদদের ওপর!'

'ভালো। তা আপনি কি এবার সত্যি সত্যি বলবেন— আমার কাছে আসলে কী চান আপনি ?'

চোখ দুটোয় চতুর ভাব নিয়ে মৃদুল বলল, 'চাইলে দেবেন ?'

'সেটা পরের ব্যাপার, আগে বলুন।'

মাথার চুলগুলোয় আলতো হাত বুলিয়ে মৃদুল আরো একটু এগিয়ে এলো টুসীর দিকে, 'আমি আসলে কিছুই চাই না।'

'তাহলে ?'

'শুধু একটা কথা বলতে এসেছি।'

কিছুটা রাগত স্বরে টুসী বলল, 'কী কথা ?'

'কথাটা শোনার পর আপনার চোখ দুটো গ্যাসের চুলোর মতো দপ্ করে জ্বলে উঠতে পারে, মেজাজটা বিগড়ে গিয়ে হতে পারে করলার মতো তেতো, নিউজপ্রিন্ট কাগজের মতো কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হতে পারে আমার মাথার চুলগুলো, কিংবা বাংলা সিনেমার নায়িকার মতো ঠাস্ করে চড়ও বসিয়ে দিতে পারেন গালে।'

'আমার ক্লাসের সময় চলে যাচ্ছে।'

'দুঃখিত, আমি আর মাত্র এক মিনিট সময় নেবো। কোনো উদ্দেশ্যে নয়, স্রেফ মন চাইলো বলে, স্রেফ একটু ভালো লাগবে বলে, কেউ যদি কাউকে কিছু দেয়, তবে কি সেই জিনিসটা ফেরত দেওয়া উচিত ?'

পূর্ণ চোখে একবার মৃদুলের দিকে তাকাল টুসী। ফ্ল্যাটের মূল গেটের বাইরে পা রাখার আগেই তার কেন যেন মনে হয়েছিল, আজ কোনো একটা ঝামেলা হতে পারে। প্রতিদিন সকালে সে ভার্সিটিতে যায়। প্রায় প্রতিদিনই এ রকম একটা ভাবনা আসে তার, কিন্তু কোনো কিছুই হয় না, কোনো দিনই না। ব্যতিক্রম হলো কেবল আজকের দিনটা। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তার এ মুহূর্তে, কারো ওপর নয়, নিজের ওপর। তবু যথাসম্ভব শান্ত স্বরে মৃদুলকে বলল, 'আপনি কি আমাকে কিছু দিতে চান ?'

'জি।'

মৃদুলের দিকে সরাসরি হাত এগিয়ে দিল টুসী, 'দিন।'

এতোক্ষণ পেছনে রাখা ডান হাতটা সামনে আনলো মৃদুল। পূর্ণ ফোটা একটা কদম ফুল ধরে আছে সে। কিছুটা ইতস্তত, কিছুটা সংকোচ, কিছুটা দ্বিধা নিয়ে ফুলটা এগিয়ে দিলো সে টুসীর দিকে। কিন্তু কোনো রকম সংকোচ, কোনো রকম দ্বিধা না করে ফুলটা হাতে নিলো টুসী। মৃদুলের চোখ দুটো হেসে উঠলো হঠাৎ, হাসি হাসি চোখে সে দেখলো–লাখ লাখ প্রজাপতি উড়ছে চারদিকে, প্রজাপতিগুলো আবার ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তারা হাসছে, ঘন ঘন ডানা ঝাপটাচ্ছে, তাদের নীল পাখা আরো নীল হচ্ছে, লাল পাখা আরো লাল হচ্ছে, রঙিন হয়ে যাচ্ছে চারদিক। আবার হঠাৎ মনে হচ্ছে, বাতাসে ভেসে আছে অনেকগুলো ফুলের কলি, কলিগুলো ফুটছে, পাপড়ি মেলছে, অদ্ভুত এক ঘ্রাণে ভরে যাচ্ছে বাতাস। চারদিকে কেবল সুখ আর সুখ, বিমোহিত করা সুখ।

বড় রাস্তার মোড়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে একবার পেছন ফিরে তাকাল টুসী। না, মৃদুলকে আর দেখা যাচ্ছে না। বুক থেকে দীর্ঘ একটা শ্বাস ছেড়ে সে তার হাতে রাখা ফুলটার দিকে তাকাল। তারপর ফুলটা হঠাৎ ছুড়ে ফেলে দিলো রাস্তার একপাশে।

রাস্তার মোড়টা পার হয়ে পাশের রাস্তায় পা রেখেই টুসী চমকে উঠল আবার; এবং সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়াল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলো, ফেলে দেওয়া সেই ফুলটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৃদুল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো সে টুসীর দিকে। চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকা টুসীর একেবারে কাছে এসে সে বলল, 'বেশির ভাগ মানুষের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা কী, জানেন-সে আসলে যার ওপর রাগ করে, তাকে কিছু বলতে পারে না। রাগটা প্রকাশ করে নিতান্তই নিরীহ কিছু জিনিসের ওপর। তাই তো দাম্পত্য কলহে দম্পতিরা নিজেদের হাত-পা না ভেঙে কাচের গ্লাস ভাঙে; ক্ষমতার লড়াইয়ে এক দল আরেক দলের মাথা ভাঙতে না পেরে বাস ভাঙে, ট্রাক ভাঙে; জমির ভাগাভাগিতে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে দা দিয়ে কোপাতে না পেরে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জমি নষ্ট করে। আর আপনি আমার ওপর রাগ করে আমাকে ছুড়ে না ফেলে এই পবিত্র ফুলটাকে ফেলে দিলেন। আপনি কি জানেন, এই ফুলটায় অনেক ভালোবাসা আছে ? ভালোবাসা ছুড়ে ফেলে দিলে ভালোবাসার কষ্ট হয়!'

'তাই ?'

'জি।'

টুসী আবার হাত এগিয়ে দিলো মৃদুলের দিকে, মৃদুল আবার ফুলটা তুলে দিলো টুসীর হাতে। টুসী এবার এক মুহূর্ত ভাবল না, এক মুহূর্ত হাতেও রাখল না ফুলটা। মৃদুলের সামনেই ছুড়ে ফেলে দিলো মাটিতে। তারপর হনহন করে হেঁটে গেল সামনের দিকে।

কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল মৃদুল। তারপর খুব ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ফুলটার দিকে। কাছে পৌঁছেই হাঁটু মুড়ে বসে ফুলটা তুলে নিলো। যত্ন করে এবং অসচেতনভাবেই সেটা ঠেকিয়ে রাখল বুকের কাছে।

টুসীর পথের দিকে চেয়ে মৃদুল হাসছে। কিন্তু চোখ দুটো চিকচিক করছে তার। কেন ? হয়তো এমনি, অথবা কোনো কারণ আছে, কিংবা...।

বাথরুমের দরজা খুলেই মারুফ কপাল কুঁচকে বলল, 'এতো ডাকছো কেন ?'

'ডাকবো না তো কী করবো। সেই কখন বাথরুমে ঢুকেছিস, সেটা খেয়াল আছে তোর!'

'প্লিজ মা, আর মাত্র পাঁচ মিনিট।'

'কতক্ষণ ধরে এই পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট করছিস!'

'এই শেষ পাঁচ মিনিট।'

'মুখে এসব কী মেখেছিস ?' বলেই মিসেস আয়শা রহমান এগিয়ে গেলেন মারুফের দিকে, 'একি! তুই ভ্রূও প্লাক করেছিস নাকি!'

'মা, তুমি যাও তো, আমি আর পাঁচ মিনিট সময় নেবো।'

'আচ্ছা, তুই কি মেয়ে যে এসব করিস! তোর লজ্জা করে না ?'

'লজ্জা কেন করবে! রূপচর্চা কি কেবল মেয়েদেরই কাজ, ছেলেরা করতে পারে না ?'

'ছেলেরা রূপচর্চা করে, কিন্তু তোর মতো করে না। মুখে উপটান দিয়েছিস, তা নাহয় মানলাম, কিন্তু ভ্রূও প্লাক করতে হবে!'

'তোমরাই তো বলো আমার ভ্রূ দেখতে বিশ্রী লাগে।'

'তাই বলে–।' মিসেস রহমান আর কিছু বলেন না, গটগট করে হেঁটে যান নিজের ঘরে।

দরজা বন্ধ করে মারুফ আবার বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়াল। মুখে মাখানো জিনিসগুলো ঘসে ঘসে তুলে মুখটা ধুয়ে নিলো সে। ভ্রূ দুটো ভালোভাবে দেখে হাসি হাসি করে ফেলল চেহারাটা। প্রায় দেড় ঘণ্টা বাথরুমে কাটানোর পর মারুফ যখন বের হয়ে এলো, তার অসম্ভব মোটা শরীরটা তখন ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে ঘামে। বাইরে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস রহমান আবার এগিয়ে এলেন মারুফের কাছে, 'ভার্সিটির একজন ছাত্র যে মেয়েদের মতো করে চলাফেরা করে, এটা আমার জানা ছিল না!'

কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে গিয়ে আবার আয়নার সামনে দাঁড়াল মারুফ। মুখে লোশন মাখলো, ক্রিম মাখলো, পাউডার মাখলো, তারপর কদিন আগে কেনা ফুলহাতা শার্টটা পরলো। মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা পরার আগে

আঁচড়ে নিলো মাথাটা। আয়নার খুব কাছে গিয়ে ভ্রূ দুটো আবার দেখেই মুখটা হাসি হাসি করে ফেলল সে। একটু পর ভেংচি কেটে দাঁতগুলো দেখে পুরো চেহারাটা আবার দেখে নিলো ভালোভাবে। শেষে প্যান্ট পরে সারা গায়ে পারফিউম মেখে সে যখন তার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, দশটা বেজে গেছে তখন। দ্রুত জুতো-মোজা পরে বাইরের দরজা খোলার আগেই মা বললেন, 'এতো সেজেগুজে কোথায় যাচ্ছিস ?'

'একটু কাজ আছে।'

'কাজটা কোথায় আছে ?'

'বলা যাবে না।'

মিসেস আয়শা রহমান অপলক চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার ছেলে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে, তিনি তাকিয়ে আছেন এবং তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তিনি ভীষণ চমকে উঠলেন। ছোট থেকেই তার ছেলেটা বেশ বোকা ধরনের, মেয়েলি গলার স্বর, হাঁটার ভঙ্গিও কিছুটা মেয়েদের মতো। ইদানীং তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে সত্যি সত্যি মেয়েদের মতো হয়ে যাচ্ছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন-না, মারুফকে দ্রুত একবার ডাক্তার দেখানো দরকার।

পরপর তিনবার কলবেল বেজে উঠতেই বিরক্ত মুখে মিসেস সোমা চৌধুরী বললেন, 'টোটন-টুনি, দেখ তো কে এলো ?'

রান্নাঘর থেকে পায়ের কোনো শব্দ পেলেন না মিসেস চৌধুরী। কিছুক্ষণ পর কলবেলে আবার শব্দ হলো। মিসেস চৌধুরী আরো বিরক্ত হলেন, 'এই টোটন, তোকে কী বললাম!'

কলবেল আবার বেজে উঠতেই রান্নাঘর থেকে প্রায় ছুটে এলেন মিসেস চৌধুরী। কিন্তু তার আগেই টোটন আর টুনি দৌড়ে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। কিছুটা রেগে মিসেস চৌধুরী বললেন, 'কোথায় থাকিস তোরা ? কতক্ষণ ধরে কলবেল বাজছে, শুনতে পাচ্ছিস না!'

'স্যরি মা, শুনতে পাইনি।' টোটন মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল।

'স্যরি মা, শুনতে পাইনি।' টুনিও মায়ের দিকে তাকাল।

'কাজের বুয়াটা কদিন ধরে আসছে না, কী যে ঝামেলায় আছি! রান্না করতে করতে দিন চলে যায়।'

'স্যরি মা।' মায়ের দিকে আরো একটু এগিয়ে গেলো টোটন।

'স্যরি মা।' মায়ের দিকে টুনিও এগিয়ে গেলো।

'এতো স্যরির কী হলো। কোনো কিছু হলেই শুধু স্যরি আর স্যরি।'

'স্যরি মা, আর স্যরি বলবো না।' টোটন মুখ গম্ভীর করে বলল।

'আবার স্যরি!'

'স্যরি মা, আর স্যরি বলবো না।'

ফিক্ করে হেসে ফেললেন মিসেস চৌধুরী। ক্লাস ফাইভ এবং ফোরে পড়া তার এই ছেলেমেয়ে দুটো যেমন দুষ্টু হয়েছে, তেমনি ওদের বুদ্ধিও হয়েছে যথেষ্ট। ক্লাসে তো ভালো রেজাল্ট করেই, কথাবার্তাতেও থাকে বুদ্ধির ছাপ। সারাক্ষণ একসঙ্গে থাকবে, ঘুমাবে একসঙ্গে, খাবে একসঙ্গে, লেখাপড়া করবে একসঙ্গে এবং নানা ধরনের দুষ্টু দুষ্টু বুদ্ধিও বের করবে একসঙ্গে। পরম মমতায় বাচ্চা দুটোকে জড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, 'তোরা এতো দুষ্টু হয়েছিস কেন, বল তো ?'

'দুষ্টুমি করতে ভালো লাগে মা।'

'টুসী কই ?'

'আপু তো আপুর ঘরে।'

'কলবেল বাজছে, ড্রইংরুমের দরজা খুলে দেখ তো কে এলো। রান্না বোধহয় পুড়ে গেলো। আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।'

কলবেল বেজে উঠলো আবার। টোটন আর টুনি দৌড়ে ড্রইংরুমে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। পাশ থেকে ছোট্ট টুলটা নিয়ে টোটন তার ওপর উঠে চোখ রাখল আই হোলে। তারপর আই হোল থেকে চোখ সরিয়ে টুনির দিকে তাকিয়েই দুষ্টু একটা হাসি দিলো সে। চোখ দিয়ে ইশারা করে নিজেদের মধ্যে কী কী যেন বলেও ফেলল ওরা। নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ইশারা ও আলোচনা শেষ করে দরজার ছিটকিনিটা খুলে ফেলল টোটন। ছয় তলার ফ্ল্যাটের মারুফকে দেখেই দুজন কপালে হাত ঠেকিয়ে একসঙ্গে বলে উঠলো, 'স্লামালিকুম মারুফ ভাইয়া।'

কিছুটা লাজুক হেসে মারুফ বলল, 'তোমরা কি আমাকে একটু ভেতরে আসতে বলবে ?'

টুনি এগিয়ে গিয়ে বলল, 'কেন ভাইয়া ?'

'আমার ভেতরে আসতে ইচ্ছে করছে যে।'

টোটন টুল থেকে নেমে বলল, 'আপনার ভেতরে আসতে ইচ্ছে করছে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা কি জানতে পারি, আপনার কেন ভেতরে আসতে ইচ্ছে করছে ?'

'একটু গল্প করতাম।'

'কার গল্প ভাইয়া ?' টুনি মাথা তুলে মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রাজা-রানীর ?'

'না।'

'তাহলে ভূতের গল্প ?'

'না।'

'তাহলে নিশ্চয় শেয়ালের গল্প ?'

'না।'

টুনি ওর নিজের গালের সঙ্গে একটি আঙুল ঠেকিয়ে কী যেন ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ কিছুটা শব্দ করে বলল, 'অ, বুঝেছি–।'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই মারুফ বলল, 'কী বুঝেছো ?'

চোখ দুটো পিটপিট করে টুনি বলল, 'বলবো ?'

বেশ উৎসাহিত হয়ে মারুফ একটু এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ, বলো বলো।'

'টুসী আপুর গল্প।'

'অ... ইয়ে... অ...।' কেমন যেন একটা মোচড় দিয়ে মারুফ বলল, 'তা আমি কি ভেতরে আসতে পারি ?'

'আসবেন ?' টোটন টুলটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলল, 'আসেন।'

টুনির দিকে তাকিয়ে মুখটা হাসি হাসি করে মারুফ, 'তুমি কী বলো টুনি, আসবো ?'

'আসবেন ?' টুনিও এক পাশে সরে গিয়ে বলে, 'আসেন।'

ঘরে ঢুকেই সোফায় হেলান দিয়ে বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মারুফ। টোটন আর টুনি কাছে আসতেই মারুফ সোজা হয়ে বসে বলল, 'তোমাদের মাথায় অনেক বুদ্ধি, না ?'

'হ্যাঁ, আমরা ভাবছি কিছু বুদ্ধি কেজি দরে বিক্রি করে দেবো।' টোটন মারুফের পাশে বসে বলে।

'তাই! তা কত করে কেজি বিক্রি করবে ?'

'আপাতত সেটা ভাবা হয়নি।' টুনিও মারুফের আরেক পাশে বসে বলল, 'পরে ঠিক করে নেবো।'

'অ্যা... ইয়ে...।' মারুফ নিজের হাত দুটো নিজেই কচলাতে কচলাতে বলল, 'ইয়ে... তোমাদের টুসী আপু কি বাসায় আছে ?'

'কেন ?' খুব আগ্রহের ভান করে টোটন মারুফের দিকে তাকাল।

'একটু গল্প করতাম।'

'ইয়ে ভাইয়া...।' টোটন একটু সোজা হয়ে বসল, 'আমরা আপনার জন্য দুঃখিত, আবার সুখিত।'

'সুখিত! সুখিত মানে কী ?'

'দুঃখিত মানে যেমন দুঃখ পাওয়া, সুখিত মানে তেমনি সুখ পাওয়া, মানে সুখী।' টুনি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে এসে মারুফের দিকে তাকাল।

'অ, আচ্ছা। এবার তাহলে বলো, তোমরা আমার জন্য দুঃখিত কেন, আবার সুখিত কেন ?'

'দুঃখিত এ কারণে যে, টুসী আপু বাসায় নেই।' দুঃখ দুঃখ চেহারা করে টোটন বলল।

'আর সুখিত এ জন্য যে, টুসী আপু আপনাকে একটা কথা বলেছে।' সুখী সুখী চেহারা করে টুনি বলল।

'আমাকে বলেছে!' কিছুটা লাফ দিয়ে সোফা থেকে উঠতে গিয়েই আবার বসে পড়ল মারুফ, 'কী বলেছে, কখন বলেছে ?'

টুনি কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই টোটন তাকে হাত দিয়ে ইশারা করে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তার আগে একটা কথা বলি ভাইয়া ?'

'বলো বলো।' মারুফ একটু ঝুঁকে এলো টোটনের দিকে।

'শুনেছি, আপনি ভার্সিটিতে পড়েন, আপনি নাকি ছাত্রও ভালো। আমাদের একটা অঙ্ক শিখিয়ে দেবেন ?'

'অবশ্যই। একটা কেন, অনেকগুলো অঙ্ক শিখিয়ে দেবো।'

'থ্যাংকু ভাইয়া।' টোটন একটু ঘুরে বসে বলল, 'ভাইয়া, আপনার একটা মানিব্যাগ আছে না ?'

'হ্যাঁ আছে।' প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বের করলো মারুফ।

'ধরুন–।' মারুফের হাত থেকে মানিব্যাগটা হাতে নিলো টোটন। তারপর খুব কৌশলে সেটা খুলে সেখান থেকে একটা একশ টাকার নোট বের করলো সে। সেটা হাতে নিয়েই মানিব্যাগটা ফেরত দিয়ে বলল, 'ধরুন এ মানিব্যাগ থেকে একটা একশ টাকার নোট নেওয়া হলো।'

কিছুটা গদগদ হয়ে মারুফ বলল, 'হলো।'

'ভাইয়া, এবার বলুন তো, এ টাকাটা কার হাতে ?'

'কেন, তোমার হাতে।'

নোটটা মারুফের দিকে বাড়িয়ে দিলো টোটন, 'আমি এখন এ টাকাটা আপনাকে দিলাম।'

টুনি সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এবার বলুন তো ভাইয়া, আপনাকে এ টাকাটা কে দিলো ?'

ঝটপট প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার মতো মারুফ ঝটপট উত্তর দিলো, 'তোমরা দিলে।'

'এখন আমাদের দেওয়া এ টাকা থেকে যদি দুটো বড় কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল কেনা হয়, তাহলে আর কতো টাকা থাকবে ভাইয়া ?' টোটন ক্লাসের শিক্ষকের মতো মুখটা গম্ভীর করে ফেলল।

'উম্।' মারুফ হিসাব করতে থাকে, 'দুটো বড় ড্রিঙ্কসের বোতলের দাম তো ত্রিশ-ত্রিশ ষাট টাকা। তাহলে একশ টাকা থেকে ষাট টাকা বাদ দিলে থাকে চল্লিশ টাকা। হ্যাঁ। চল্লিশ টাকা থাকবে।'

'গুড।' টুনি মারুফের হাত ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে এনে বল, 'এখন এ চল্লিশ টাকা থেকে যদি বিশ টাকার চুইংগাম কেনা হয়, তাহলে বাকি আর কতো টাকা থাকবে ?

'উ...ম... বিশ টাকা।'

'সত্যি ভাইয়া ?' টুনি কিছুটা অবাক চোখে মারুফের দিকে তাকাল।

'তা-ই তো থাকবে।'

'আচ্ছা ভাইয়া, প্রতিটা অঙ্ক মেলাতে নাকি প্রমাণ লাগে ?'

'হ্যাঁ লাগে।'

'কিন্তু ভাইয়া, আমরা প্রমাণ পাবো কোথায় ?'

'প্রমাণ কোথায় পাবে ?' মারুফ নিজেই যেন নিজেকে প্রশ্নটা করলো, তারপর প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার মতো উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা করো, আমি নিচে গিয়ে দুটো বড় ড্রিঙ্কসের বোতল আর বিশ টাকার চুইংগাম কিনে এনে তোমাদের প্রমাণ দেখাচ্ছি যে, তারপর সত্যি সত্যি বিশ টাকা বাঁচবে।'

'ভাইয়া, আপনি এতো কষ্ট করবেন ?'

'ছি, কষ্ট কেন, এই পাঁচতলা থেকে নেমে যাবো, জিনিসগুলো কিনবো, আর নিয়ে আসবো। তোমরা একটা অঙ্ক শিখতে চেয়েছ আমার কাছে, আর আমি সে অঙ্কটা শেখাবো না, তা কি হয় ?'

মৃদুলের সঙ্গে পুরনো একটা চুক্তি আছে লোপার। বেশি পুরনো নয়, অল্প পুরনো। কোনো কারণে যদি তার মন খারাপ হয়ে যায়, তবে যত দ্রুত সম্ভব মনটা ভালো করে দিতে হবে মৃদুলের। বিনিময়ে সে যা চাইবে, লোপা তা-ই দেবে, দিতে বাধ্য থাকবে। মৃদুল তা করেও আসছে, চুক্তির দিন থেকেই করে আসছে। কিন্তু তার বিনিময়ে এ পর্যন্ত সে কিছুই চায়নি, এমনকি চাওয়ার প্রতি আগ্রহও দেখায়নি কোনো রকম। শুধু একদিন হেসে হেসে লোপাকে বলেছিল, 'যদি তোর কাছে আজ একটা জিনিস চাই, তুই কি তা দিবি ?'

পূর্ণ চোখে বেশ কিছুক্ষণ লোপা তাকিয়ে ছিল মৃদুলের দিকে, একেবারে ওর চোখের দিকে। তারপর খুব আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলেছিল, 'বল, তুই কী চাস ?'

'সত্যি দিবি ?'

'বল, তুই কী চাস ?' লোপা আরো আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলল।

কিছুটা অবাক হয়ে গেলো মৃদুল লোপার আত্মবিশ্বাস দেখে, এমনকি কিছুটা দমেও গেল সে মনে মনে। প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলার জন্য সে তখন অন্য একটা কথা বলতে গিয়েই থেমে গেলো। সরাসরি মৃদুলের মুখটা হাত দিয়ে চাপা দিয়ে লোপা রাগী রাগী চোখ করে বলেছিল, 'তুই কী চাস, আমি আগে সেটা জানতে চাইছি।'

মৃদুল বেশ বিব্রত হয়ে বলল, 'আজ থাক, অন্য একদিন বলবো।'

'না।' যতটা রেগে লোপা কথাটা বলল, তার চেয়ে বেশি রাগ ফুটে উঠলো ওর চোখেমুখে।

'তুই কিছু মনে করবি না তো ?'

'তুই কি মনে করার মতো কিছু বলবি ?'

'ঠিক তা না।'

'তাহলে ?'

'তবু।'

লোপা আবার সরাসরি মৃদুলের চোখের দিকে তাকাল। বেশ কিছুক্ষণ সেভাবে তাকিয়ে থেকে শেষে মাথা নিচু করে বলল, 'মৃদুল, তুই তো জানিস আমি আমার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। গোলাপ ফুল পছন্দ করি বলে প্রতিদিন আমার ঘরে এক তোড়া গোলাপ ফুল আসে, পরের দিন তোড়াটা পাল্টে যায়; আকাশের

কাছাকাছি একটা ঘর চেয়েছিলাম একদিন বাবার কাছে, শহরের সবচেয়ে উঁচু ফ্ল্যাটটা কিনে দিয়েছেন বাবা আমাকে; সবচেয়ে অভিজাত স্বর্ণের দোকানটা আমার জন্য মুক্ত, আমি যা ইচ্ছে তা-ই নিতে পারবো সেখান থেকে, যদিও স্বর্ণ আমি পছন্দ করি না। জীবনের অনেক কিছু এখন আমার হাতের মুঠোয় রে, অনেক কিছুই। সেসব তুচ্ছ করে, সেসব ফেলে দিয়ে, আমি প্রায় প্রতিদিনই তোদের এই নিম্নমধ্যবিত্তের ব্যাচেলর রুমে আসি, সে কেবল একটু ভালো লাগে বলে, একটু শান্তির ছোঁয়া পাই বলে। সেই তুই আমার কাছে কিছু চাইবি আর আমি তাতে কিছু মনে করবো কি না, সেটা আবার তুই বলছিস!'

'স্যরি লোপা, আমি সেভাবে বলিনি।'

'আমার কাছে কখনো কেউ কিছু চায় না, সবাই দিতে চায়। সবাই দেয়ার আনন্দ পায়, কিন্তু আমাকে দেয়ার আনন্দ দিতে চায় না।'

'আমি আবারও স্যরি।'

'জানিস, প্রতিদিন যখন আমি সবচেয়ে দামি গাড়িটা নিয়ে তোদের বাসার সামনে থামি, আড়চোখে তাকিয়ে দেখি আশপাশের সব মানুষ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার তখন খুব আনন্দ হয়। কোলাহল মুখর ব্যস্ত এই নাগরিক শহরে কেউ কারো দিকে তেমন তাকায় না, অন্তত এই মানুষগুলো যখন তাকাচ্ছে, বড্ড ভালো লাগে তখন।' লোপা একটু থেমে বলে, 'মৃদুল, তুই একটা জিনিস চাইবি বলছিলি।'

মৃদুল আরো একটু এগিয়ে এলো লোপার দিকে, তারপর বেশ ইতস্তত করে বলল, 'এক জীবনে একটা মেয়ের সবকিছু আমি জানতে চাই, সব জানতে চাই, স-ব।' মৃদুল লোপার ডান হাতটা নিজের হাতে এনে বলল, 'তুই কি তোর সবকিছু একদিন বলবি আমাকে ?'

লোপা মৃদুলের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'বলবো, একদিন অবশ্যই তোকে বলবো।'

'থ্যাংকু।' সমস্ত উচ্ছ্বাস নিয়ে মৃদুল ছোট্ট করে কেবল এ শব্দটাই বলল।

লোপার আজ মন খারাপ। প্রতিদিন মৃদুলের ঘরে ঢুকে সে প্রথমে ওদের বিছানায় বসে থাকে কিছুক্ষণ। চুপচাপ মাথা নিচু করে কী যেন ভাবে একা একা। এ সময় কেউ তাকে বিরক্ত করে না, এমনকি ঘরের ভেতর তেমন শব্দও করে না কেউ। বসে থাকতে থাকতে লোপা যখন কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে, কেবল তখন সবাই কথা বলা শুরু করে।

কিন্তু লোপা আজ অন্যরকম কিছু করছে। আজ ঘরে ঢুকেই ও বলেছে, 'প্রচণ্ড হাসির একটা গল্প বলবি আজ মৃদুল, প্রচণ্ড হাসির গল্প। সে গল্প শুনে হাসতে হাসতে চোখে পানি আনতে চাই আমি, টলটলে পানি। আচ্ছা বল তো মৃদুল, হাসির জল আর কান্নার জল— আলাদা করে এ দুটো চিনবি কীভাবে ?'

'মন খারাপ ?'

'প্রতিদিনের মতো।' লোপা পা দুটো গুটিয়ে এনে আরো গুছিয়ে বসে বলল, 'কিরে, রোহিত, জাহিদ, শোয়েব, রেজা— ওরা কই ?'

'রোহিত টিউশনিতে গেছে, জাহিদ ওর এক আত্মীয়কে দেখতে হাসপাতালে গেছে, শোয়েব সম্ভবত ওর খালুর বাসায় গেছে, আর রেজা কোথায় গেছে সেটা জানি না।'

'আচ্ছা রেজার কি কোনো প্রবলেম চলছে ?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকে বলা যাবে, যদি কোনো সমাধান আনতে পারি ?'

'অবশ্যই বলা যাবে, তবে তুই কোনো কিছু করতে পারবি না, আমি চেষ্টা করছি।'

'ব্যাপারটা কি সিরিয়াস কিছু ?'

শব্দ করে হেসে বলল মৃদুল, 'হ্যাঁ, অন্তত রেজার কাছে।'

'কিরে, এতোক্ষণ তো খেয়ালই করিনি, এই ভরদুপুরে তুই রুমে পড়ে আছিস কেন, বাইরে কোনো কাজ নেই ?'

'না, আজ আর বাইরে যাবো না।'

'রান্নাবান্না কিছু হয়েছে ?'

'সকালে বুয়া এসে রেঁধে দিয়ে গেছে। আজ নাকি বুয়ার কী একটা কাজ আছে, দুপুরে আসতে পারবে না, তাই সকালেই রেঁধে দিয়ে গেছে।'

দরজার দিকে শব্দ হতেই লোপা মৃদুল ফিরে তাকিয়ে দেখলো, রোহিত আর জাহিদ হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকছে।

'লোপা তুই ?' রোহিত ঘরে ঢুকেই লোপার পাশে বসে বলল, 'মন খারাপ ?'

'তোর ?'

'ভালো, বলতে পারিস, বেশ ভালো। দারুণ একটা জোক্স শুনেছি আজ, শুনবি ?'

'হাসির ?'

'প্রচণ্ড হাসির।'

লোপা সঙ্গে সঙ্গে রোহিতের হাত চেপে ধরে বলল, 'প্লিজ, তাড়াতাড়ি বল।'

'আচ্ছা' তার আগে একটা কথা জেনে নিই।'

রোহিতকে থামিয়ে দিলো লোপা, 'কথা-টথা পরে হবে, আগে জোক্সটা বল। কিরে জাহিদ, চুপচাপ বসে আছিস কেন ওখানে, মুড অফ নাকি ?'

'আর বলিস না।' জাহিদ মৃদুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোয়েব শালা আসেনি ?'

'কেন, কী হয়েছে ?'

'কাল রাতে আমার একমাত্র ভালো শার্টটা লন্ড্রি থেকে ইস্ত্রি করে আনলাম না, সকালে উঠে দেখি শার্টটা নেই। শোয়েব শালা গায়ে দিয়ে গেছে।'

'খালুর বাসায় গেছে তো।'

'খালুর বাসায় না, খালাতো বোনের সঙ্গে প্রেম করতে গেছে, আসুক শালা আজ।' রাগে গজগজ করতে থাকে জাহিদ।

'জাহিদ।' লোপা উঠে এসে জাহিদের মাথায় চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে বলল, 'বন্ধু না ?'

'হ্যাঁ, সে জন্যই তো কিছু বলি না, শুধু মুখেই বলি। কিরে রোহিত, লোপাকে জোক্সটা বল!'

'হ্যাঁ। স্বামী গ্রামের এক এনজিওতে চাকরি করে, স্ত্রী থাকে শহরে। সপ্তাহের ছুটির দিন স্বামী এক দিনের জন্য শহরে এসে পরের দিন আবার গ্রামে চলে যায়। একদিন স্বামী ছুটির দিনের আগেই শহরে চলে এলো। স্ত্রী এই সময় তার সাবেক প্রেমিকের সঙ্গে গল্প করছিল। স্বামীর এই হঠাৎ আগমনে স্ত্রী চমকে উঠলো ভীষণ। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সে একটা বুদ্ধি বের করে ফেলল। প্রেমিকের সারা শরীরে ক্রিম মেখে তার ওপর পাউডার ছিটিয়ে দিল সে। তারপর ঘরের এক কোনায় তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বলল, তুমি হচ্ছো এখন একটা মূর্তি, একেবারে পাথরের মূর্তি, একদম নড়বে না, ওকে ?

পাথরের মূর্তির মতোই দাঁড়িয়ে রইলো প্রেমিক। স্বামী ঘরে ঢুকে মূর্তির কাছে গিয়ে বেশ ভালোভাবে দেখলো মূর্তিটাকে। তারপর হাতমুখ ধুয়ে খাবার খেতে বসলো।

মাঝরাতে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে স্বামী আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে মূর্তিটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তার পাশে রাখা ফ্রিজ থেকে এক টুকরো পুডিং বের করে মূর্তিটার মুখের কাছে নিয়ে বলল, বন্ধু, নিশ্চয়ই তোমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, এই পুডিংটুকু খেয়ে নাও। আমিও একবার আমার সাবেক প্রেমিকার বাসায় পুরো দুদিন এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, কিন্তু কেউ কিছু খেতে দেয়নি আমাকে।' রোহিত লোপার দিকে তাকাল, 'কিরে, হাসলি না যে !'

'অ্যাডাল্ট ধরনের কৌতুক শুনতে ভালো লাগে না আমার।'

'স্যরি দোস্ত, এবার একটা ভালো কৌতুক বলি। বিয়ের পর জামাই এসেছে শ্বশুরবাড়িতে। সকালে তাকে দাঁত পরিষ্কারের জন্য ব্রাশ ও টুথপেস্ট দেওয়া হলো। জামাই পেস্ট বের করে ব্রাশে না লাগিয়ে মুখে দিয়ে দেখলো বেশ মিষ্টি মিষ্টি লাগে তো জিনিসটা! তারপর সে সবটুকু পেস্ট খেয়ে ফেলল। জামাইয়ের সঙ্গে আসা তার ভাগ্নেকে কথাটা বলতেই ভাগ্নে কিছুটা রেগে গিয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না, মামার মাথায় একটু দোষ আছে, টুথপেস্ট যে রুটি দিয়ে খেতে হয় মামা এখনো তা জানে না।' রোহিত আবার লোপার দিকে তাকাল, 'কিরে, এবারও হাসলি না যে ?'

'কেন জানি আজকাল হাসি আসে না রে।'

'আরেকটা জোক্‌স শুনবি ?'

'নাহ্‌, অন্য দিন শুনবো।'

জাহিদ হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, 'কিরে, আজও ডাল আর আলুভর্তা! বুয়া আজ বাজারে যায়নি ? প্রতিদিন এই ডাল আর আলুভর্তা দিয়ে ভাত খেতে খেতে পেটে চর পড়ে গেছে।'

জাহিদের মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল। বাটনটা চেপেই হাসি হাসি চেহারা করে ফেলল জাহিদ, 'কে, মুমু ? হ্যাঁ, ইয়ে... আমি ভালো আছি। না না, ভাত খাইনি, এইমাত্র খেতে বসলাম। কী দিয়ে খাচ্ছি ? আর বোলো না, মৃদুল আজ দুটো মুরগি কিনে এনেছে। না না, মুরগি না, মোরগ কিনে এনেছে, আর রোহিত কিনে এনেছে চারটা ইলিশ। ইলিশ মাছ ইদানীং বেশ সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে তো। মোরগ দুটো রোস্টের মতো করা হয়েছে, দুটো ইলিশ তেলে ডুবিয়ে ভাজা হয়েছে আর দুটো ইলিশ আলু দিয়ে সুন্দর করে রান্না করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো থেকো, কাল দেখা হবে, বাই।'

মোবাইলটা পাশে রেখেই জাহিদ মৃদুল, রোহিত, লোপার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'মোরগ আর ইলিশ মাছের কথা বলে তো খিদেটা আরো বেড়ে গেল রে।'

ছলছল চোখে লোপা জাহিদের দিকে তাকাল। তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'আমি তো রাঁধতে পারি না। আমি যদি মাঝে মাঝে হোটেল থেকে এখানে খাবার কিনে আনি কিংবা হোটেলে তোদের খেতে নিয়ে যেতে চাই, তোরা কি মাইন্ড করবি ? প্লিজ, মাইন্ড করিস না। তোরা খুব মজা করে খাবি, আর আমি তোদের সামনে বসে তা দেখবো, অপলক চোখে দেখবো। মাঝে মাঝে তোদের প্লেট থেকে নিয়ে আমি মুখে দেবো, তোরাও আদর করে এক টুকরো দু টুকরো আমার মুখে তুলে দিবি, তোদের অকৃত্রিম সে আদর পেয়ে চোখ ভিজে উঠবে আমার, আনন্দে আমি কেঁদে ফেলবো নীরবে। কারণ কোনো দিন কোনো আপনজন কিংবা কোনো প্রিয়জন আমাকে কোনো খাবার তুলে দেয়নি মুখে, মাথায় হাত রেখে আদর করে বলেনি, খা মা, খা।'

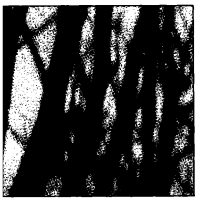

তিন দিন আগেও কেউ যদি বলত, রেজা কবি হবে, তবে পরিচিতজনদের অনেকেই তাকে উন্মাদ ভাবতো, এমনকি আড়ালে-আবডালে পাগল বলেও ডাকতো। রেজা কখনো কবিতা পড়েছে কিংবা আবৃত্তির ঢঙে কখনো কবিতা নিয়ে গুনগুন করেছে অথবা কোনো কবিতার বই মেলে ধরেছে চোখের সামনে— কেউ বলতে পারবে না, কেউ না। তার সবচেয়ে কাছের বন্ধুরাও কখনো দেখেনি— রেজা কোনো কবিতার বই ছুঁয়েছে কখনো, কোনো দিন।

তার সঙ্গে কবি এবং কবিতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি তর্ক হতো শোয়েবের। শোয়েবকে বলা হয় রবীন্দ্রগ্রস্ত। সব সময় দ্বিধা নিয়ে যে থাকে, সে দ্বিধাগ্রস্ত; অভাবে সব সময় জীবন যাপন করে যে, সে অভাবগ্রস্ত; আর রবীন্দ্রনাথ নিয়ে সব সময় থাকে বলে শোয়েব রবীন্দ্রগ্রস্ত।

মাঝরাতে একদিন ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো শোয়েব। ওর ঘুম ভাঙার শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো সবারই। রেজা বেশ বিরক্তি নিয়ে বলল, 'কিরে, রবীন্দ্রনাথের কিছু হয়েছে নাকি ?

শোয়েব ছোট্ট করে উত্তর দিল,'হ্যাঁ।'

শোয়া থেকে সোজা হয়ে বসলো রেজা, 'কী হয়েছে ?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুম তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করে শোয়েব বলল, 'না না, রবীন্দ্রনাথের কিছু হয়নি।'

'তাহলে ?'

'একটা স্বপ্ন দেখেছি আমি।'

'কী দেখেছিস ?' রেজা একটু এগিয়ে এলো শোয়েবের দিকে।

'দেখি, কে যেন গলায় দড়ি দিয়ে গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে আমাকে।'

রেজা অবাক হওয়ার মতো করে বলল, 'বলিস কি!'

'হ্যাঁ।

'তারপর ?'

'তারপর আর কী। আমি ঝুলে আছি, সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে তা দেখছে। সবচেয়ে ভঙ্ককর ব্যাপার কী জানিস, দেখি, ঝোলানো আমার দিকে সবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমিও তাকিয়ে আছি।'

'ইন্টারেস্টিং!' রেজা একটু ঝুঁকে এলো শোয়েবের দিকে, 'তার মানে স্বপ্নে তুই তোর মতো দু-জনকে দেখেছিস— যার একজনকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে গাছের সঙ্গে, আরেকজন তাকিয়ে আছে ওই ঝোলানো শোয়েবের দিকে। তাই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'এতে ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ার কী হলো ?'

'এ জন্য আমি ভয় পাইনি।'

'তাহলে ?'

'স্বপ্নে দেখি, আমার পাশে রবীন্দ্রনাথও দাঁড়িয়ে ঝোলানো আমার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং একটু পরপর দাড়িতে হাত দিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।'

'তাই নাকি! কিন্তু এতে তো ভয় পাওয়ার কিছু দেখি না।'

'ঠিক ভয় পাইনি।' শোয়েব একটু আমতা আমতা করে বলে, 'রবীন্দ্রনাথকে দেখে ভীষণ চমকে উঠেছি।'

'কেন, চমকে উঠলি কেন ?' চোখ দুটো বড় বড় করে রেজা বলল, 'রবীন্দ্রনাথের হাতে কি কোনো বাঁশ ছিল ?'

হতাশার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো শোয়েব, 'তা তো খেয়াল করিনি!'

'খুব খারাপ করেছিস, তোর প্রিয় মানুষ, আর তার হাতে বাঁশ আছে, না কাঁচা কঞ্চির বেত আছে, তা খেয়াল রাখা উচিত ছিল। কাল থেকে খেয়াল রাখবি, ঠিক আছে ?'

মাথা কাত করল শোয়েব, 'ঠিক আছে।' তারপর বিছানা থেকে নেমে কিছুটা দুলে দুলে হেঁটে গিয়ে ওর টেবিলের চেয়ারে বসলো। সেভাবে বসে থেকেই কী যেন ভাবলো ও। শেষে একটা খাতা টেনে নিয়ে কিছু একটা লিখতে গিয়েই থেমে গেল শোয়েব। রেজা ওর পেছনে দাঁড়িয়ে কিছুটা ধমকের স্বরে বলল, 'কী করবি এখন ?'

'কবিতা লিখবো।'

'এত রাতে!'

'ভালো কবিতা লিখতে হলে মধ্যরাতেই লিখতে হয়।'

'ভালো কবিতা মানে কী ?'

'ভালো কবিতা মানে ভালো কবিতা!'

'শোন।' রেজা কিছুটা শক্ত করে শোয়েব কাঁধ চেপে ধরে বলল, 'ভালো কবিতা কাকে বলে জানিস ? পুরো একটা পৃষ্ঠা যে কোনো লেখা দিয়ে ভরে ফেলবি প্রথমে, তারপর পৃষ্ঠার মাঝখানে প্রায় সমান করে ছিঁড়ে ফেলবি। এখন সেই দুই টুকরো কাগজে যা লেখা থাকবে, তাকেই বলা হয় ভালো কবিতা।'

'এটা একটা কথা হলো!' কাঁধ থেকে রেজার হাতটা সরিয়ে দিয়ে শোয়েব বিরক্ত মুখে বলল, 'কবিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলেছিলেন।'

শোয়েবের টেবিলের ওপর বসলো রেজা, 'তোকে বলেছেন ?'

'আমাকে বলবেন কেন ?'

'তাহলে বললি যে ?'

'বইয়ে লেখা আছে।'

'অ।'

'তা কী বলেছেন জানিস ?'

'কবে বলেছেন ?'

রাগ করে উঠে দাঁড়াল শোয়েব। বিছানার দিকে হেঁটে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল হঠাৎ। তারপর রেজার দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোদের সাথে কথা বলে মূর্খরা।'

রেজা মুচকি হেসে বলে, 'নিজেকে তাহলে চিনতে পারলি!'

কবি এবং কবিতাবিদ্বেষী সেই রেজা এখন বসে আছে একটা খোলা মাঠের ঘাসের ওপর। তার হাতে একটা খাতা আর একটা কলম। দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে বসে আছে সে এখানে। ভালো একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করছে সে।

মাথা নিচু করে বসে আছে রেজা। পরপর তেইশটা পৃষ্ঠা নষ্ট করে একটা লাইনও লিখতে পারেনি সে। একটা লাইন লিখতে যায়, শেষ হওয়ার আগেই অপছন্দ করে ফেলে লেখাটা। সঙ্গে সঙ্গে কাগজটা টান দিয়ে ছিঁড়ে মুচড়ে ফেলে দেয় পাশে।

রেজা পাশ ফিরে তাকায়। বাতাসে মোচড়ানো কাগজগুলো উড়ছে, হঠাৎ মাথায় একটা কবিতা এসে যায় তার। ঝটপট তিনটা লাইন লিখে ফেলে সে। চতুর্থ লাইনটা লেখার আগেই সে তাকিয়ে দেখে একটা লোক দাঁড়িয়ে তার সামনে।

'বাবাজি, একা একা বসে আছেন এখানে, শরীরটা ভালো ?'

লোকটার দিকে ভালোভাবে তাকায় সে! কাঁধে একটা ব্যাগ ঝোলানো আছে লোকটার, ময়লা ধরনের একটা পাঞ্জাবি গায়ে, উঁচু করে পাজামা পরা, মুখে অল্প দাড়ি, যার অধিকাংশই পেকে গেছে, পেকে গেছে মাথার চুলগুলোও।

'জি ভালো।'

'মনটা ?'

'মনও ভালো।'

'ছবি আঁকছেন বসে বসে ?'

'না।'

'মাঠের মধ্যে কয়টা গরু আছে, তা লিখে রাখছেন ?'

'না।'

'তাহলে বোধহয় চিঠি লিখছেন ?'

'কিসের চিঠি ?'

'মানুষ সাধারণত দুঃখ পেলে এখানে আসে। তারপর আত্মহত্যা করার চিন্তা করে এবং সেটা করার আগে একটা চিঠি লেখে।'

'না, আমি চিঠি-টিঠি কিছু লিখছি না।'

লোকটা রেজার পাশে বসে পড়ল। তারপর রেজার দিকে একটু ঝুঁকে এসে বলল, 'তাহলে কী করেন ?'

কিছুটা গর্বিত ভঙ্গিতে রেজা বলল, 'কবিতা লিখছি।'

কিছুটা লাফিয়ে উঠতে গিয়ে লোকটা আবার বসে পড়ল, 'কবিতা লিখছেন!'

'হ্যাঁ।'

'একটু শোনান না ?'

গলাটা একটু কেশে নিয়ে খাতাটা চোখের সামনে মেলে ধরে রেজা—

'মোচড়ানো কাগজগুলি উড়িয়া যাইতেছে,
আমার সামনে দিয়া বহিয়া যায় একটি নদী,
সেইখানে এই ভরদুপুরে পূর্ণিমার চাঁদ খেলা করে...।'

হাত উঁচু করে রেজাকে থামিয়ে দিয়ে লোকটা বলল, 'ভরদুপুরে পূর্ণিমার চাঁদ পেলেন কই ?'

'কেন, ভরদুপুরে পূর্ণিমার চাঁদ পাওয়া যায় না ?'

'ভাইজান, কিছু খাইছেন নাকি ?'

'না না, কী খাবো ?'

'আপনার জন্য আমার এখন কষ্ট হচ্ছে ভাইজান, আবার ভালোও লাগছে।'

'ভালো লাগছে কেন ?'

'ভালো লাগছে এই জন্য যে, সাত-আট বছর আগে আমিও এখানে বসে আপনার মতো কবিতা লিখতাম।'

'কী সুন্দর বৃষ্টি, না!'

কথাটা শুনলো টুসী, কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না, এমনকি পাশ ফিরে তাকালও না। কারণ টুসী জানে, কথাটা কে বলল। টুসী এও জানে, মানুষটা আরো কিছু বলবে।

'শুনতে পাচ্ছেন ?

টুসী এবারও কিছু বলল না। সে কেবল কথাটাই শুনলো আর একটু ভাবলো। ভাবলো এ জন্য যে, তার অন্তত এবার একটা উত্তর দেওয়া দরকার। কিন্তু উত্তরটা দেওয়ার আগেই সে আবার শুনলো— 'বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই না ?'

পাশ ফিরে তাকাল এবার টুসী। তারপর মৃদুলকে দেখেই কিছুটা রূঢ় স্বরে বলল, 'চোখে ইদানীং কোনো সমস্যা হচ্ছে আপনার ?'

'আমার চোখে!' কিছুটা অবাক হয়ে মৃদুল বলল, 'না তো!'

'একটু কম দেখেন, এ রকম কিছু ?'

'না।'

'তাহলে ঝাপসা ঝাপসা দেখেন ?'

'না।'

'অথবা সামনে যা আছে, তার উল্টো দেখেন ?'

'এ রকম কোনো কিছুই হচ্ছে না।' মৃদুল আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলল, 'চোখ ভালো আছে আমার, খুব ভালো আছে।'

ভ্রূর মাঝখানে ভাঁজ ফেলে টুসী মৃদুলের দিকে তাকাল, 'তাহলে প্রশ্ন করছেন কেন আমাকে ?'

'কোন প্রশ্ন — সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে কি না এটা ?'

'হ্যাঁ।' কপালে নেমে আসা চুলগুলোকে পেছনে ঠেলে দিয়ে টুসী বলল, 'বেশ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে কি না, এটাও।'

'এগুলোকে কি ঠিক প্রশ্ন বলে ?'

'আপনার কী মনে হয় ?'

'ব্যাপারটা এ রকম ।' মৃদুল একটু ঘুরে দাঁড়াল টুসীর দিকে। তারপর মুখটা হাসি হাসি করে ক্লাসে উত্তর না পারা কোনো ছাত্রীকে প্রশ্নের উত্তর বোঝানোর

ভঙ্গিতে বলল, 'ধরুন, কেউ একজন বাজারে যাচ্ছেন। তখন পরিচিত আরেক ব্যক্তি তাকে দেখেই বুঝতে পারলেন লোকটি বাজারে যাচ্ছেন। তবু ওই লোকটি বাজারে যাওয়া ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন-বাজারে যাচ্ছেন ? আবার আপনি হয়তো কোনো বান্ধবীর বাসায় গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন আপনার বান্ধবীটি খাচ্ছে, তখন আপনি প্রথমেই তাকে কী বলেন ? বলেন না-কিরে, খাচ্ছিস নাকি ?'

'এগুলো তো পরিচিত জনেরা কিংবা বন্ধুরা বলে, আমি তো আপনার বন্ধু নই!'

'জানি।'

'তাহলে ?'

'বন্ধুত্ব তো সৃষ্টি করতে হয়।'

'বন্ধুত্বের মানে জানেন ?'

'জানি।' টুসীর চোখের দিকে তাকিয়ে মৃদুল বলল, 'অন্যের প্রতিচ্ছবি সম্পূর্ণরূপে নিজের মাঝে স্থাপন করাই হচ্ছে বন্ধুত্ব।'

'মানুষ পারে এ রকম করতে ?'

'পারে । আপনার বন্ধুর জন্য আপনি হয়তো চোখ দিতে না পারেন, তাকে তো এক ব্যাগ রক্ত দিতে পারেন; তার ভেঙে যাওয়া ঘরের নির্মাণ সামগ্রী আপনি না কিনে দেন, ঘরটা মেরামত করার সময় আপনি তো অন্তত তার পাশে থাকতে পারেন; তার দুঃসময়ে আপনার সাহায্য করার কোনো ক্ষমতা না থাকতে পারে, কিন্তু তার দুঃসময়ের জন্য আপনি দুঃখী তো হতে পারেন।'

টুসী কিছু বলল না। কেবল আড়চোখে একবার মৃদুলকে দেখে আবার সামনের দিকে তাকাল। বৃষ্টিটা আরো জোরে নেমেছে।

'বন্ধু কিংবা বন্ধুত্ব নিয়ে খুব ভালো একটা কথা গেঁথে আছে আমার মনে।' মৃদুল বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনবেন ?'

'কথাটা কি আপনার ?'

'না।'

'তাহলে ?'

'একটা বইয়ে পড়েছি।'

'বলুন।'

মিষ্টি করে হাসলো মৃদুল, 'জল যখন দুধের সঙ্গে প্রথম মিলিত হলো, দুধ নিজের সব গুণ দিয়ে তাকে আপন করে নিলো। এমন যে বন্ধু দুধ— তাকে আগুনে উত্তপ্ত হতে দেখে জল প্রথমে নিজেকে আগুনে সমর্পণ করলো। এ দৃশ্য দেখে আগুন নেভাবার জন্য দুধ উথলে উঠলো। কিন্তু যখন তার ওপর জলের ছিটে দেওয়া হলো, তখন আপন বন্ধুকে পেয়ে ফিরে দুধ শান্ত হয়ে গেল।' বৃষ্টি থেকে চোখ ফিরিয়ে আনলো মৃদুল, 'কী, সুন্দর না কথাটা ?'

'সুন্দর।'

'আচ্ছা, আমি কি বেশি কথা বলছি ?'

চোখ ও নাক কুঁচকে টুসী একটু হেসে বলল, 'একটু।'

'বেশি কথা বলা নিয়ে একটা কথা বলি ?'

'বলুন।'

'কথাটা একটু অন্যরকম।'

'তাতে কী ?'

'আপনি মাইন্ড করবেন না তো ?'

'কথাটা কি মাইন্ড করার মতো ?'

'ঠিক তা না।'

'তাহলে নির্দ্বিধায় বলুন।'

'ছেলেরা যখন প্রেমে পড়ে, তখন নাকি সে বেশি কথা বলে, মেয়েরা চুপ করে থাকে। আবার বিয়ের পর নাকি মেয়েরা বেশি কথা বলে, ছেলেরা চুপ করে থাকে।'

'মানেটা কী দাঁড়াল ?' ওড়নাটা একটু টেনে নিলো টুসী, 'বিয়ের পর ছেলেদের আর প্রেম থাকে না, আর মেয়েদের প্রেম শুরু হয় বিয়ের পর, তাই তো ?' দুষ্টুমির হাসি হেসে টুসী বলল, 'আপনি কি প্রেমে পড়েছেন ?'

মৃদুলের মনে হলো, কথাটা টুসীর নয়, অন্য কারো, অপরিচিত কারো, যাকে সে কোনো দিন দেখেনি। বুকের ঠিক মাঝখানটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে গেল হঠাৎ, হালকা হালকা লাগছে শরীরটা, এক ধরনের নির্ভার অনুভূতি এসে ঠাঁই নিলো সমস্ত অস্তিত্বে। মাথাটা নিচু করে বেশ কিছুক্ষণ মাটির রূপ দেখার পর মৃদুল বলল, 'আজ যাই, জরুরি একটা কাজ আছে।'

'পালাতে চাইছেন ?'

'নাহ্। পালাবো কেন ?'

'মানুষ যখন নিজেকে অতিক্রম করতে পারে না, যখন তার কাছে কোনো প্রশ্নের উত্তর থাকে না, তখন সে পালাতে চায়।'

'উত্তর কিন্তু আমার কাছে ছিল এবং আছে।'

'তাহলে বলুন।'

'প্রেমে মানুষ সব সময়ই পড়ে, কিন্তু সবার প্রেমে পড়ে না। প্রেমে পড়ার মানুষ থাকে আলাদা।'

'যেমন ?'

'সে হবে একজন বোধের অংশীদার, যার মুখ চেয়ে আগলানো যায় সমস্ত জীবন, যার হাতে হাত রেখে হওয়া যায় সাহসী কোনো স্বপ্নচারী, যাকে মনে হয় আশ্রয়, চিরকালীন আশ্রয়, বাবুইপাখির বাসার মতো রহস্যময়, স্বপ্নগাঁথা আশ্রয়।'

মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে এলো বাতাসে। রাস্তার ওপাশে সোনালু ফুল ফুটেছে অনেক। হলুদ ফুলগুলো বৃষ্টিতে ভিজছে আর অল্প অল্প দুলছে যেন কোনো চপল তরুণীর ঘামে ভেজা মুখের পাশে কানের দুলগুলো দুলছে, ছন্দে ছন্দে দুলছে।

'আশ্রয় কি কখনো চিরকালীন হয় ?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে মৃদুলের দিকে তাকাল টুসী।

'হয়।'

'কই ?' টুসী চারপাশটা একবার চোখ ফিরিয়ে দেখলো, 'এই যে আমরা রাস্তার পাশের এই যাত্রীছাউনির পাশে দাঁড়িয়েছি. বৃষ্টির কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য আশ্রয় নিয়েছি, একটু পর আবার চলে যাবো। কই, আশ্রয় তো শেষ হয়ে গেল।'

'আসলেই কি ? এ আশ্রয় থেকে সরে গিয়ে আপনি কোনো যানবাহনে আশ্রয় নেবেন, সেখান থেকে আবার কোনো ঘরে আশ্রয় নেবেন, তারপর আবার কোথাও। আশ্রয় ছাড়া মানুষ বাঁচে ?'

'যাদের আশ্রয় নেই ?'

'তাদের দেহ বেঁচে আছে, কিন্তু মরে গেছে তার সবকিছু— মন, আত্মা, অস্তিত্ব, সব, স-ব।'

'আচ্ছা–।'

হাত দিয়ে টুসীকে থামিয়ে দিলো মৃদুল, 'আর একটু।' বাতাসে ভেসে আসা বৃষ্টিকণা থেকে পিছিয়ে এলো টুসী, মৃদুলও। 'আশ্রয় আসলে পরিবর্তনশীলও, সেটা কারণে কিংবা অকারণে, সময়ে কিংবা অসময়ে। আচ্ছা, বলতে পারবেন, কোন জিনিসটা একই সঙ্গে কষ্টের এবং সুখের ?'

'কোন জিনিসটা ?'

'অপেক্ষা। অপেক্ষা নিয়ে একটা গল্প শুনবেন ?'

'বলুন।'

'ছেলেটা মেয়েটাকে যতোটুকু ভালোবাসতো, মেয়েটা ততোটুকু ভালোবাসতো কি না ছেলেটা তা জানে না। তবু তারা কথা বলতো, গল্প বলতো, আড্ডা দিতো, বেড়াতো। হঠাৎ একদিন ছেলেটা মেয়েটাকে বলল, তোমার সঙ্গে আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না আমার। অবাক হয়ে মেয়েটা বলল, কেন ? ছেলেটা বলল, এমনি। মেয়েটা ছেলেটার দিকে নীরব চোখে তাকাল। তারপর খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, ঠিক আছে, যখন কখনো তোমার কথা বলতে ইচ্ছে হবে, তখন আমাকে বোলো, ফোন কোরো। তিন দিন পর ছেলেটা মাঝরাতে একদিন ফোন করলো মেয়েটাকে। প্রথম রিং বাজার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা রিসিভ করে বলল, বলো। অবাক হয়ে ছেলেটা বলল, তুমি এখনো জেগে আছো! মেয়েটা সরল গলায় বলল, গত তিন দিন আমি ঘুমাইনি প্রিয়, কেবল তুমি ফোন করবে বলে, তোমার কথা বলার ইচ্ছে হবে বলে। যখনই ঘুম এসে ছুঁতে চাইতো আমার চোখজোড়া, আমি মিনতি করে বলতাম— একটু সময় দাও বন্ধু, আমি অপেক্ষা করে আছি আমার প্রিয় মানুষটির জন্য, আমি বসে আছি আমার প্রিয় আবার জন্য। আজ তো তোমার কোলে ঠাঁই নেওয়া যাবে

না ঘুমবন্ধু, যদি আমাকে ডেকে না পেয়ে সে কষ্টমুখর হয়, যদি না পাওয়ার দুঃখে সে মলিন করে ফেলে মুখটা!'

'তারপর ?' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে টুসীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো শব্দটা।

ছোট একটা শ্বাস ছাড়লো মৃদুলও, 'তারপর তারা সারা রাত কথা বলল।'

'হ্যাঁ, অপেক্ষায় কষ্ট আছে, আবার সে অপেক্ষা শেষে আছে সুখও।'

বৃষ্টি কমে এসেছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিকণাগুলো এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। আশপাশের মানুষও চলতে শুরু করেছে যে যার গন্তব্যে। টুসী একটু আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মৃদুল বলল, 'আজ বোধহয় আর ক্লাস হবে না, ভার্সিটিতে যাবেন, না বাসায় যাবেন এখন ?'

'আপনার কী মনে হয়, নৌকাভ্রমণে যাবো এখন ?'

'না, মনে হচ্ছে বাংলা সিনেমা দেখতে যাবেন।'

'কী!'

মৃদুল হাসতে হাসতে বলল, 'আচ্ছা, বৃষ্টিতে ভিজেছেন কখনো ?'

'না।'

'ভিজতে ইচ্ছে করে না ?'

'না।'

'কখনো করে না ?'

'না।'

'কে যেন বলেছিলেন— যে তরুণীর বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করে না, সে হয় পাথর, নাহয় দেবী। আপনি পাথর, না দেবী ?'

'মানুষ।'

'মানুষের বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করে।'

'আমার করে না।'

'একদিন ঝুমবৃষ্টিতে হাত রেখে কারো হাতে
পথ চলি আমরা
ভিজে যায় চোখ, চোখের পাতা
ভিজে যায় আমাদের সনাতনী মন....

কার কবিতা জানেন ?'

'না।'

'আমিও জানি না। একটা কথা বলি। টিপ টিপ এই বৃষ্টিতে আমরা দুজন কি একটু হাঁটতে পারি, একটু ভিজতে পারি ?' মৃদুল টুসীর চোখের দিকে তাকাল, 'কী, হাঁটবেন, ভিজবেন ?'

মারুফ কিছুটা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'জানো টোটন, জানো টুনি, রাতে না আমার একদম ঘুম হয়নি।'

চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে বড় করে ফেলল টোটন, 'কেন ভাইয়া, আপনার কি পেটব্যথা করেছে ?'

'না।' মারুফের গলার স্বর কেমন যেন চেপে আসে।

'তাহলে পা ব্যথা ?' মারুফের কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়ার আগেই টুনি মারুফের কপালে হাত রেখে কী যেন দেখল কিছুক্ষণ। তারপর অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতো গলা কিছুটা গম্ভীর করে বলল, 'কিংবা মাথাব্যথা ?'

'না।' আরো কাতর শোনায় মারুফের গলা।

'উম্‌ম।' সবকিছু বুঝতে পেরেছে এমন একটা ভাব নিয়ে মারুফের দিকে তাকাল টোটন, 'আপনি তাহলে স্বপ্ন দেখেছেন।' হি হি করে হাসতে হাসতে টোটন টুনির দিকে তাকাল, 'নিশ্চয় ভূতের স্বপ্ন, তাই না টুনি ?'

'আবার পেত্নীর স্বপ্নও হতে পারে।' টুনি টোটনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই না ভাইয়া ?'

'না।' মারুফের গলাটা আরো ম্লান শোনায়।

'না!' অবাক কণ্ঠে টোটন চোখ দুটো পিটপিট করে কী যেন ভাবল। তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হাসতে হাসতে মারুফের পিঠে গুরুজনসুলভ মৃদু একটা চাপড় দিয়ে বলল, 'এবার বুঝতে পেরেছি, কাল রাতে কেন আপনার ঘুম হয়নি।'

'আমিও।' টুনিও হাসতে হাসতে মারুফের পিঠে একটা কিল মারে।

খুব আগ্রহ নিয়ে মৃদুল বিড়ালের মতো মিঁউ মিঁউ করে বলল, 'কী, বুঝতে পেরেছ তোমরা ?'

'কাল রাতে আপনার বাথরুম হয়নি।' হি হি করে আবার হেসে উঠল টোটন, 'আর বাথরুম হয়নি বলে আপনি সারা রাত ঘুমাতে পারেননি।'

'আর ঘুমাতে পারেননি বলে—।' টুনি চোখ দুটো আরো বড় বড় করে বলল, 'আপনার চোখ দুটোও খোলা ছিল।'

'চোখ খোলা থাকলে তো আর ঘুম হয় না।' নিজের কথায় নিজেই মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন করলো টোটন, 'ঘুম হওয়ার প্রশ্নই আসে না, তাই না ভাইয়া ?'

'ব্যাপারটা অনেক কষ্টেরও বটে।' টুনি টোটনের দিকে তাকাল, 'আব্বুরও তো কোনো কোনো রাতে ঘুম হয় না।'

'হ্যাঁ, কোনো কোনো রাতে আব্বু ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ হেঁটে বেড়ায়, মাঝে মাঝে উপুড় হয়ে ব্যায়াম করে, কখনো কখনো পেটের ওপর দু-একটা ঘুসিও দেয়, তবু আব্বুর কিছুতেই কিছু হয় না। একটু পরপর আব্বু বাথরুমে যায়, কিছুক্ষণ পর ঘেমে-টেমে ভিজে একাকার হয়ে আবার বের হয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে আম্মু দৌড়ে এসে বলে, কিছু হলো ? আব্বু মাথাটা এদিক-ওদিক করে কান্না কান্না মুখে বলে, না। সে রাতে আব্বু একদম ঘুমাতে পারে না, এমনকি বিছানাতেও বসে না। ভাইয়া, আপনার কি আব্বুর মতো হয়েছে ?'

'না।' কিছুটা রাগ করে বলল মারুফ।

'এবারও না!' অবাকের চরম পর্যায়ে গিয়ে টোটন কিছুটা হতাশ হয়ে বলে, 'আমি স্যরি ভাইয়া, আপনার ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।'

'আমিও স্যরি।' টুনি চেহারাটা দুঃখী দুঃখী করে বলল, 'সত্যি সত্যি স্যরি।'

'না না, তোমরা স্যরি হবে কেন ?' মুখ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে মারুফ বলল, 'আসলে—।' মারুফ আর কিছু বলল না, মাথাটা নিচু করে ফেললো সে।

'আসলে ?' টোটন আর টুনি প্রায় একসঙ্গে বলল কথাটা। তারপর খুব আগ্রহী চোখে মারুফের দিকে তাকাল। 'কোনো সমস্যা ভাইয়া ?' টুনির সারামুখে উদ্বিগ্নতার ছোয়া, ও মারুফের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বসলো।

'আসলে এটা কোনো সমস্যা না, আবার সমস্যাও বলতে পারো।' মারুফ সোজা হয়ে বসলো, 'আর যদি সমস্যা বলা হয় একে, তাহলে এটা শুধু সমস্যা না, মহা সমস্যা।'

'আম্মু প্রায়ই বলে, প্রত্যেকটা সমস্যার নাকি সমাধান আছে। ভাইয়া-।' মারুফের একটা হাত নিজের দু হাতের মধ্যে এনে টোটন বলল, 'আমরা কি আপনার সেই সমস্যার কোনো সমাধানে সাহায্য করতে পারি ?'

'পারো।' ছোট্ট করে উত্তরটা দিয়েই মাথাটা নিচু করে ফেলল মারুফ।

'বলুন।' টুনি আরেকটু এগিয়ে এসে টোটনের দিকে ঘুরে তাকাল, 'আমরা আমাদের জান দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবো, তুই কি বলিস ভাইয়া ?'

'শুধু জান না, প্রাণ দিয়েও সাহায্য করবো।' টোটন আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে মারুফের দিকে তাকাল।

'জান আর প্রাণ তো একই।' মারুফ কিছুটা অভিমানী গলায় টোটনকে বলল।

'আমি জানি তো।' খিলখিল করে আবার হেসে উঠল টোটন, 'জান আর প্রাণ একসঙ্গে বললে কেমন যেন একটু সাহস সাহস লাগে। তাই বললাম।'

'তা ভাইয়া, আপনার সমস্যাটা এবার বলুন।' টুনি কিছুটা সাহসী হওয়ার মতো সোজা হয়ে বসস, 'দেখি কী করতে পারি আমরা।'

'আসলে সমস্যা তো তেমন কিছু না।' মারুফ আমতা আমতা করে বলল, 'মানে, মানে..., টুসী আমাকে কী বলেছে, সেদিন সে কথাটা তো তোমরা আমাকে বললে না!'

'এটাই আপনার সমস্যা ?' প্রচণ্ড হতাশ হওয়ার মতো চেহারা করলো টোটন, 'এটা একটা সমস্যা হলো!'

'টুসী আমাকে একটা কথা বলেছে আর সে কথাটা আমি জানতে পারলাম না, এটা একটা সমস্যা হলো না ?' মারুফ আগের মতো কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, 'কথাটা না শুনতে পেলে আমার একদম ঘুম হবে না টোটন।'

'আপনার ব্যথাটা আমরা এখন বুঝতে পারছি ভাইয়া।' টুনি গলাটা ভারী করে বলল, 'কিন্তু আমাদের একটা সমস্যা আছে ভাইয়া।'

'তোমাদের সমস্যা!' মারুফ এবার সাহসী হওয়ার মতো শিরদাঁড়া সোজা করে বলল, 'আমাকে বলো, দেখি আমি তোমাদের জন্য কী করতে পারি।'

'সমস্যা তেমন জটিল না ভাইয়া।' টুনি মারুফের দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বলল, 'আম্মু আছে তো বাসায়, তাই বলতে একটু সমস্যা হবে।'

'কারণ—।' টোটন মারুফের দিকে তাকাল, 'টুসী আপুর কথাটা আপনাকে বলতে নিলাম—।'

'ঠিক তখনই আম্মু এসে হাজির হলো।' টুনি টোটনের দিকে তাকাল, 'তারপর বলল, মারুফকে তোমরা টুসীর কথা কী বলছো ?'

'আবার এও বলতে পারে, ঘরের কথা পরের কাছে কেন ?' টোটন বলল।

'অথবা আপনাকেই বলতে পারে, মারুফ, তুমি টুসীর কথা ওদের জিজ্ঞেস করেছো কেন ?' টুনি হাসতে হাসতে বলল, 'ব্যাপারটা আপনার জন্য লজ্জার হয়ে যাবে না ?'

'তাহলে আমাদের বাসায় চলো।' মারুফ উঠে দাঁড়াল।

'আপনাদের বাসায় মানুষজন আছে না!'

'না, কেউ নেই। সবাই একটা বিয়েতে গেছে।'

'আপনি গেলেন না ?'

'ইদানীং আমার কিছু ভালো লাগে না টোটন।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল মারুফ, 'কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না টুনি।'

মারুফদের ঘরে ঢুকেই দ্রুত ফ্রিজের কাছে গিয়ে দাঁড়াল টোটন, পাশে গিয়ে দাঁড়াল টুনিও। তারপর দুজন মুগ্ধ হয়ে ফ্রিজের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। দেখতে দেখতে ফ্রিজের গায়ে আলতো করে হাত রেখে টোটন বলল, 'ভাইয়া, আপনাদের ফ্রিজটা দেখতে খুব সুন্দর।'

'রঙটাও চমৎকার।' টুনিও ফ্রিজে হাত রাখল, 'অন্যরকম কালার।'

'আমাদের ফ্রিজটাও সুন্দর।'

'হ্যাঁ, তবে আমাদের ফ্রিজের ভেতরটা তেমন ভালো না।'

'ভাইয়া।' টোটন মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের ফ্রিজের ভেতরটা কেমন ?'

মারুফ বেশ আগ্রহী হয়ে বলল, 'ফ্রিজটা খুলে দেখো।'

টোটন খুব সাবধানী হাতে ফ্রিজটা খুলে একটু উপুড় হয়ে ভেতরের দিকে তাকাল, সঙ্গে টুনিও। বেশ কিছুক্ষণ ফ্রিজের ভেতরটা ভালোভাবে দেখে টোটন আড়চোখে টুনির দিকে তাকাতেই দেখল, টুনিও তাকিয়ে আছে আড়চোখে। তারপর টোটন দেখল, ফ্রিজের ভেতরের থরে থরে সাজানো মিষ্টি, হরেক রকমের লাল-সবুজ ফল, কোকসহ কোকের বোতল আর সোনালি কাগজে মোড়ানো চকলেটগুলো ভেসে আছে টুনির চোখের ভেতর। টুনিও দেখল, ফ্রিজের জিনিসগুলো ভেসে আছে টোটনের চোখের ভেতরও। দুজন দুজনের চোখের ভেতর জিনিসগুলো দেখে আর নিজেদের ঠোঁটগুলো চেটে নেয় চুপি চুপি।

'ভাইয়া।' টোটন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের ফ্রিজের ভেতরটাও সুন্দর।'

'শুধু ভেতরটা না।' টুনিও সোজা হয়ে দাঁড়াও, 'ভেতরের জিনিসগুলো সুন্দর।'

মারুফের পাশে এসে সোফায় বসলো টোটন, 'ভাইয়ারা খুব মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন, না ?'

'কিংবা মিষ্টি আপনাদের খুব পছন্দ করে, না ?' টুনিও মারুফের আরেক পাশে বসলো।

'হ্যাঁ, বাসায় সবাই খুব মিষ্টি পছন্দ করে।' মারুফ একবার টোটন, একবার টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা খাবে ?'

'ঠিক খেতে চাইছি না।' টোটন কথাটা মারুফকে বলল কিন্তু তাকাল টুনির দিকে।

টুনি হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু একটা সুখবর বলবো তো আপনাকে!'

'আম্মা বলে–।' টোটনও মুখটা হাসি হাসি করল, 'সুখবর বলার আগে নাকি মিষ্টিমুখ করতে হয়।'

'আবার সুখবর বলার পরও নাকি ভালো কিছু খেতে হয়।' টুনি বলল।

'অবশ্যই অবশ্যই।' কিছুটা গদগদ হয়ে যায় মারুফ, 'তোমরা বসো, আমি মিষ্টি নিয়ে আসি।'

'আপনি শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন ?' টোটন বলল।

'আমরাও আপনাকে সাহায্য করি।' টুনি বলল।

'না না, তোমরা বসো।' টোটন আর টুনির গালে আলতো করে টোকা দিলো মারুফ, 'তোমরা হচ্ছো আজ আমার গেস্ট।'

'জি। আমি হচ্ছি চিফ গেস্ট।' টোটন মারুফের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর ও হচ্ছে স্পেশাল গেস্ট।'

'কিংবা আমি হচ্ছি শ্রদ্ধেয় অতিথি।' টুনি টোটনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও হচ্ছে বিশেষ শ্রদ্ধেয় অতিথি।'

'আবার দু-জনকেই প্রধান অতিথি বলা যায়।' টোটন কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলল, 'আর আপনি হচ্ছেন—।'

কথাটা শেষ করতে পার না টোটন। তার আগেই মারুফ আগ্রহ নিয়ে বলল, 'আর আমি ?'

'আপনি হচ্ছেন জনগণ।'

তিন মিনিট পর মারুফ যখন একটা প্লেট বোঝাই করে মিষ্টি নিয়ে আসে, তখন দেখতে পায়, টোটন ও টুনির চোখের ভেতর মিষ্টিগুলো জ্বলজ্বল করছে আর ওদের মুখ দুটো একটু হা হয়ে আছে এবং সেই হা দিয়ে জিভ দুটো দেখা যাচ্ছে, ভেজা দুটো জিভ। প্লেটটা টেবিলে রাখার সঙ্গে সঙ্গে পাশ থেকে কাঁটাচামচ নিয়ে একটা মিষ্টি গেঁথে ফেলল টোটন, সঙ্গে সঙ্গে টুনিও। কাঁটাচামচে গাঁথা মিষ্টিটা একটু ওপরে তুলে টোটন বলল, 'নিয়ম অনুযায়ী প্রথম মিষ্টিটা খাবে প্রধান অতিথি।'

'তারপর খাবে বিশেষ অতিথি।' টুনি মারুফের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাই না ভাইয়া ?'

'তা-ই তো হওয়া উচিত।' মারুফ বলল।

'কিন্তু আজ আমরা করবো অন্য কাজ।' মিষ্টিসহ কাঁটাচামচ মারুফের মুখের দিকে এগিয়ে দিলো টোটন, 'আজ প্রধান অতিথি না, বিশেষ অতিথিও না, আজ প্রথম মিষ্টি খাবে জনগণ।'

'ঠিক। এই সুন্দর দিনে সুন্দর কাজটার প্রতি আমি সমর্থন করলাম।' টুনিও ওর হাতটা এগিয়ে দিলো মারুফের দিকে।

মারুফ কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'এটা কি ঠিক হবে ?'

'ঠিক-বেঠিকের ব্যাপার পরে।' টোটন একবার টুনির দিকে আবার মারুফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা আজ ব্যতিক্রমী কিছু করতে চাই। প্লিজ ভাইয়া, আপনি উদ্বোধন করুন।' টোটন মিষ্টিটা মারুফের একেবারে মুখের কাছে এগিয়ে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে টুনিও।

মারুফ টোটনের কাঁটাচামচের মিষ্টিটা শেষ করল, তারপর শেষ করল টুনির মিষ্টিটা, শেষে প্লেটের বাকি মিষ্টিগুলো শেষ করল টোটন আর টুনি। হঠাৎ টোটন খুক্ করে কেশে উঠল, কেশে উঠল টুনিও। সঙ্গে সঙ্গে মারুফ বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে গেলো, 'কী হলো টোটন, কী হলো টুনি ?'

মুখভর্তি মিষ্টি চিবাতে চিবাতে টোটন বলল, 'গলায় কেমন জ্যাম লেগে গেছে ভাইয়া।'

'পানি খাবে ?'

'পানিতে এ জ্যাম ছাড়বে বলে মনে হয় না।'

'তাহলে কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে আসি ?'

'এটা দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে।'

দেড় লিটারের একটা বোতল পুরো শেষ করার পর ছোট্ট দুটো ঢেকুর দিলো দুজন। ওদের এই তৃপ্তিজনিত খাওয়া দেখে তৃপ্তি বোধ করল মারুফও, 'আরো কিছু খাবে ?'

'আপাতত তেমন কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই।' টুনি কথাটা শেষ করতে পারলো না। তার আগেই টোটন কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'তবে বইয়ে পড়েছি খাওয়ার পর নাকি ফল খেতে হয়, তাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।'

'আবার খাবার হজমও হয়।' টুনি বলল।

'তাই নাকি ?' মারুফ কিছুটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'দাঁড়াও, ফ্রিজে ফলও আছে।'

চারটা আপেল, চারটা কমলা, দুটা কলা, এক বাটি আঙ্গুর শেষ করার পর দুজন বেশ ক্লান্ত গলায় বলল, 'থ্যাংকু ভাইয়া।'

'ওয়েলকাম।' গদগদ হয়ে মারুফ সারা চেহারা হাসি হাসি করে, 'আর কিছু ?'

'ভাইয়া যে কী বলেন না!' টোটন সোফায় হেলান দিলো, 'বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানে খাবার শেষে বড় মানুষরা পান-সুপারি খায়, কিন্তু আমরা তো ছোট মানুষ।'

'এ হিসেবে আমরা চকলেটকে কি পান-সুপারি মনে করতে পারি ?' অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতো বলে টুনিও সোফায় হেলান দিলো।

'অবশ্যই মনে করতে পারি। তোমরা বসো, ফ্রিজে চকলেটও আছে।'

মারুফ দু মুঠো চকলেট আনার পর সেখান থেকে মাত্র দুটো চকলেট নিয়ে মুখে পুরে দুজন। বাকি চকলেটগুলো নিজেদের মুঠোতে নিয়ে বলল, 'আপনি এতো অতিথিপরায়ণ কেন ভাইয়া ?'

প্রশংসায় মারুফের মুখটা লাল হয়ে যায়। কিছু না বলে মাথাটা নিচু করে ফেললো সে। কিছুক্ষণ পর একটু সোজা হয়ে বসে কিছুটা ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'ইয়ে টোটন, ইয়ে টুনি, তোমরা কি এবার কথাটা বলবে ?'

সোজা হয়ে বসলো টোটন, 'অবশ্যই। তবে একটা মুশকিল হয়ে গেছে যে ভাইয়া!'

'কেমন ?' কিছুটা ভয় পায় মারুফ।

'গুরুজনের কোনো কথা অন্যকে বলতে হলে তো তার অনুমতি নিতে হয়।' টোটন বলল।

'আর আপনি তো জানেন, আপু হচ্ছে আমাদের গুরুজন।' টুনি বলল।

'আপু আপনাকে একটা কথা বলেছে, কিন্তু সেটা তো আপনাকে বলতে বলেনি।' টোটন বলল।

'এতে আবার হতাশারও কিছু নেই।' টুনি মারুফের একটা হাত ধরে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বল, 'আমরা দুজন সম্মিলিতভাবে অনুরোধ করে অনুমতি নিয়ে নেবো।'

'নিতে পারবে তো ?' ভীত শোনাল মারুফের গলা।

'অবশ্যই।' টোটন টুনির দিকে তাকিয়ে বল, 'কী বলিস টুনি ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। না হলে–।'

'না হলে ?' আরো ভীত শোনায় মারুফের গলা।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল টোটন, উঠে দাঁড়াল টুনিও। তারপর মারুফের দু হাত দুজন জড়িয়ে ধরে বল, 'প্লিজ ভাইয়া, আপনি ধৈর্যহারা হবেন না। আম্মু বলে, ধৈর্যশীলকে নাকি আল্লাহ খুব ভালোবাসে।'

ঘরে ঢুকেই নিজেকে অসম্ভব অপরাধী মনে হয় লোপার। মেঝের ওপর গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে রেজা। ওর একটা হাত বুকের কাছে ভাঁজ হয়ে আছে, আরেকটা হাত রেখেছে বালিশের ওপর, তার ওপর ওর ডান গাল। আপাতত ঘরে আর কেউ নেই।

জুতো জোড়া পাশে রেখে রেজার ঠিক সামনে এসে দাঁড়ায় লোপা। তারপর হাঁটু মুড়ে ওর পাশে বসে। আলতো করে গালের নিচের হাতটা সরিয়ে দিতেই ঘুম ভেঙে যায় রেজার। সঙ্গে সঙ্গে ঝট করে উঠে বসে ও, 'লোপা, তুই!'

ভ্রূ দুটো কুঁচকে লোপা রেজার চোখের দিকে তাকায়, 'আর কেউ আসার কথা ছিল নাকি ?'

'নাহ্।' ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে রেজা, 'কারো আসার কথা ছিল না, তবে আশা ছিল।'

'স্যরি।' লোপা পা দুটো গুটিয়ে রেজার পাশে বসে, 'সে আশা আশাহত হলো।'

'প্রতিদিন তো এরকমই আমাদের, আমাদের মধ্যবিত্তের— কেবল প্রতিনিয়ত আশা আর আশাভঙ্গের লুকোচুরি।' রেজা ম্লান হেসে বলল, 'কখন এসেছিস তুই ?'

'এই তো।' লোপা হাসতে হাসতে বলে, 'তুই যখন বাঁ হাত দিয়ে তোর বাঁ গালটা চুলকাচ্ছিলি।'

'কখন চুলকালাম ?'

'যখন ঘরে ঢুকলাম।' লোপা রেজার একটা হাত নিজের কাছে টেনে আনে, 'একটা সত্যি কথা বলবি ?'

মাথা নিচু করে ছিল রেজা, চোখ তুলে তাকায়। গভীর চোখে লোপাকে দেখে উঠে দাঁড়ায় ও। জানালার কাছে গিয়ে কী যেন খোঁজে আকাশে। শেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে লোপাকে বলে, 'চা খাবি, না অন্য কিছু ?'

'চা খাবো, আছে ?'

'চিনি আর চা আছে, দুধ নাই।'

'ওতেই চলবে, রঙ চা খাবো।'

'রঙ চা কখনো খেয়েছিস ?'

'না।'

'তাহলে দরকার নেই, আমি বাইরে থেকে নিয়ে আসছি।'

লোপা উঠে দাঁড়ায়, নিঃশব্দে হেঁটে গিয়ে রেজার পাশে দাঁড়ায়, তারপর জানালার গ্রিল ধরে বাইরে তাকায় দুজন। আকাশটা নীলচে ধরনের, একপাশে ভেজা তুলোর মতো ঘোলাটে কিছু মেঘ, সেই মেঘ ভেসে যাচ্ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

'মেঘগুলোকে দেখে খুব সুখী মনে হচ্ছে।' রেজা লোপার দিকে তাকায়, 'তাই না ?'

'কী জানি।' মেঘগুলোর দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে লোপা বলে, 'কেন সুখী মনে হচ্ছে ?'

'ওরা ইচ্ছে করলেই এখান থেকে ওখানে ভেসে বেড়াতে পারে, যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে।'

'তোর কি কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে এখন ?'

'হ্যাঁ।' জানালার গ্রিলটা দু হাত দিয়ে চেপে ধরে রেজা, 'মাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে।'

ঝট করে রেজার দিকে ঘুরে তাকায় লোপা। অবাক করা চেহারাটা মুহূর্তেই ম্লান করে ফেলে সে, 'তোর মা তোকে খুব ভালোবাসেন, না ?'

'খুব, খু-ব।' রেজার চোখ দুটো বুজে আসে আবেশে, 'প্রত্যেক মা-ই তার সন্তানকে ভালোবাসেন।'

'হয়তো।' গভীর একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে লোপা, 'মা, কী অদ্ভুত একটা শব্দ।'

'প্রাণ জুড়িয়ে যায়, বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় এক নিমিষেই।' রেজা লোপার দিকে সরাসরি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, '*আমাদের মা* কবিতাটি শুনেছিস ?'

'কার লেখা ?'

'হুমায়ুন আজাদের।'

'শুনিনি।' লোপা ওর খোলা চুলগুলো খোঁপা বাঁধে, 'তুই শুনেছিস ?'

'পড়েছি।'

'তুই!'

'এতে অবাক হচ্ছিস কেন লোপা ?'

'তুই কবিতা পড়িস, এ কথাটা বিশ্বাস করতে আমার যে পুরো বারো বছর লাগবে রে।'

'আর যদি বলি, কবিতাটা আমি মুখস্থ করেছি ?'

'এটা বিশ্বাস করতে আমার বারো 'শ বছর লাগবে।'

'আমাদের মাকে আমরা বলতাম তুমি, বাবাকে আপনি।
আমাদের মা গরিব প্রজার মতো দাঁড়াতো বাবার সামনে
কথা বলতে গিয়ে কখনোই কথা শেষ করে উঠতে পারতো না
আমাদের মাকে বাবার সামনে এমন তুচ্ছ দেখাতো যে

মাকে আপনি বলার কথা আমাদের কোনোদিন মনেই হয়নি।
আমাদের মা আমাদের থেকে বড় ছিলো, কিন্তু ছিলো আমাদের সমান
আমাদের মা ছিলো আমাদের শ্রেণীর, আমাদের বর্ণের, আমাদের গোত্রের।
বাবা ছিলেন অনেকটা আল্লার মতো, তার জ্যোতি দেখলে আমরা সেজদা দিতাম
বাবা ছিলেন অনেকটা সিংহের মতো, তার গর্জনে আমরা কাঁপতে থাকতাম
বাবা ছিলেন অনেকটা আড়িয়ল বিলের প্রচণ্ড বিলের মতো, তার ছায়া দেখলেই
মুরগির বাচ্চার মতো আমরা মায়ের ডানার নিচে লুকিয়ে পড়তাম।
ছায়া সরে গেলে আবার বের হয়ে আকাশ দেখতাম।

কী, আরো শুনবি ?'

'না।'

'কেন, ভালো লাগছে না।'

'না।'

'বলিস কি!' জানালার বাইরে থেকে মুখটা ঘুরিয়েই প্রচণ্ড অবাক হয়ে যায় রেজা, 'লোপা, তুই কাঁদছিস ?'

লোপা কিছু বলে না, ওড়না দিয়ে চোখ মোছে।

'এই লোপা–।' লোপার একটা হাত টেনে ধরে রেজা, 'তুই কাঁদছিস ?'

'না, এমনি।' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বাইরের দিকে তাকায় লোপা, 'খুব সুন্দর কবিতা রে।'

'মন খারাপ হয়ে গেলো তোর ?'

'একটু।'

'ঠিক আছে, তোকে এবার একটা মজার কবিতা বলি। কার কবিতা, জানিস ?'

'কার কবিতা ?'

'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের।'

লোপা রেজার কাঁধে একটা হাত রেখে। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'ইদানীং সবকিছুই কেমন যেন মজার মজার লাগে। তবু আরো মজার কিছু শুনতে ইচ্ছে করে, দেখতে ইচ্ছে করে। এই যে আমি বেঁচে আছি, তুই বেঁচে আছিস, ব্যাপারটা মজার, না ? আজ আমার কিংবা তোর তো জন্ম হতে পারতো আফ্রিকার কোনো ক্ষুধার্ত আবাসে, না খেয়ে আমরা মরে যেতে পারতাম; আমাদের

জন্ম হতে পারতো ইরাকে, শেলের টুকরো এসে আঘাত করতো বুক বরাবর; কিংবা জন্ম হতে পারতো ক্যাপিটালিজমের কোনো দেশে, যেখানে চূড়ান্ত সভ্যতা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে প্রতিনিয়ত।'

'তোর কি কিছু হয়েছে লোপা ?'

'একদম না।' লোপা হাসে। কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় হাসার চেষ্টা করছে। বেশ কিছুক্ষণ হাসি হাসি মুখ করে সে বলে, 'কোনো কারণে তোর কি মন খারাপ রেজা ?'

ম্লান হাসে রেজা।

'কী হয়েছে তোর ?' রেজার কাঁধটা একটু খামচে ধরে লোপা।

রেজা আবার ম্লান হাসে, 'না, কিছু হয়নি।'

'মিথ্যে বলছিস কেন ?'

রেজা ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে যেতেই থেমে যায়, 'ইদানীং খুব বৃষ্টি হচ্ছে, না ?'

'হ্যাঁ।' লোপা রেজার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়, 'বৃষ্টির ব্যাপারটা অদ্ভুত।'

'কেমন ?'

'এই যেমন তোর যখন বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না, একা একা ঘরে থাকবি, বৃষ্টিটা তখন তোর বেশ ভালো লাগবে। আর যখন বাইরে যাবি, তখন বৃষ্টিটা অসহ্য মনে হবে।'

'তবুও বৃষ্টি।'

'হ্যাঁ, প্রশান্তি তময় বৃষ্টি।' লোপা রেজার দিকে আরো একটু এগিয়ে আসে, 'আচ্ছা শোন, আজ কি বাইরে বের হবি ?'

'কেন, বল তো ?'

'আগে বল, বের হবি কি না ?'

'যদি বলি হবো।'

'তাহলে তোর সঙ্গে রিকশায় একটু বেড়াতাম।'

'রিকশায় কেন, তোদের গাড়ি আবার কী দোষ করল ?'

'হুড ফেলে রিকশায় বেড়ানোয় নাকি খুব মজা।'

'হ্যাঁ, খুব মজা। কিন্তু গাড়িতে চড়ে বেড়ানো মানুষগুলো তা জানে না, সে মজাও বোঝে না।'

'তুই বুঝিস ?'

'না, আমরাও বুঝি না, আমাদের মতো মানুষগুলোও বোঝে না।' রেজা লোপার চোখের দিকে তাকায়, 'প্রতিনিয়ত সমস্যায় ভাসতে ভাসতে আমাদের আর কোনো কিছুতে মজা লাগে না।'

'তোর কি ইদানীং কোনো সমস্যা যাচ্ছে রেজা ?' লোপা আবার রেজার কাঁধে হাত রাখে।

মুখটা হাসি হাসি করে রেজা বলে, 'কোন সমস্যার কথা বলবো ?'

'তোর কি অনেক সমস্যা ?'

'বলতে পারিস।' রেজা আগের মতোই হেসে হেসে বলে, 'সকালে ঘুম ভাঙার আগেই পাশের বাসার মেয়েটির সঙ্গীতচর্চা এসে আঘাত করে দু কানে, দু কানে তখন বালিশ চাপা দিয়ে ঘুমাই; ঘুম ভাঙার পর বাথরুমে গিয়ে দেখা যায় বাথরুমে পানি নেই এক ফোঁটা, মরুভূমির মতো শুকনো সবকিছু; খেতে বসে দেখি, শুধু ভাত পড়ে আছে পাতিলে, তরকারির নামগন্ধ নেই কোথাও। এ তো গেলো ঘরের ভেতরের সমস্যা। ঘরের বাইরে বের হলেই—।'

'আমি এসব সমস্যার কথা জানতে চাইনি।'

'তাহলে ?'

'তোর আর কোনো সমস্যা নেই ?'

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকে রেজা। মাথাটা নিচু করে কী যেন ভাবে সে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে চোখ তুলে তাকায় লোপার দিকে, 'আমরা অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি ?'

'না। আমি তোর একটা স্পেসিফিক সমস্যার কথা জানতে চেয়েছি।'

'তোকে বরং আরেকটা কবিতা বলি।'

'না।'

'আহ্ শোনই না! রুদ্রের কবিতা।'

'খুব কবিতা পড়ছিস ইদানীং, না ?'

'বুকের ভেতর ঘাপটি মেরে বসে আছে নীলাঞ্জনা আকাশ
চোখের তারায় নাচে একশ কোটি নক্ষত্র
বাতাসের কানে তবু বলাবলি–
এতো ভালোবাসে কি আর কেউ!
কী বুঝলি ?'

দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ হতেই কিছুটা চমকে ওঠে দুজনই। রেজা এগিয়ে যেতেই লোপা হাত টেনে ধরে ওর, 'দরজাটা আমি খুলি।'

শোয়েব দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, কিন্তু দরজা কে খুলে দেয়, সেদিকে তাকিয়ে নেই সে। তার চোখের সামনে একটা বই মেলে ধরা, সে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে শোয়েব। লোপাও দাঁড়িয়ে থাকে আগের মতো। বেশ কিছুক্ষণ পর বেশ বিরক্ত হয়ে লোপা বলে, 'আঁতলামির একটা সীমা থাকা উচিত।'

চমকে উঠে শোয়েব বইটা সরিয়ে নেয় চোখের সামনে থেকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেলো ওর। ওর সামনে যে জলজ্যান্ত একটা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ওর সামনে যে লোপা দাঁড়িয়ে আছে, এ মুহূর্তে এটা বিশ্বাস হচ্ছে না ওর, 'লোপা, তুই এখানে!'

লোপা বেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'তুই কি অন্য কাউকে আশা করেছিলি ?'

'না মানে, তোকে এ মুহূর্তে দেখতে পাবো, সেটা আশা করিনি।'

'তোর কোনো অসুবিধা হলো ?'

'রাগছিস কেন ?'

'রাগবো না মানে। কষ্ট করে এসে দরজা খুলে দিলাম, আর উনি বই পড়ছেন দরজায় দাঁড়িয়ে। কে দরজা খুলে দিলো, কখন খুলে দিলো সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। লাট সাহেব।'

'স্যরি।'

'ওই একটা কথা স্যরি। তাতেই সব শেষ হয়ে যায়, না ?'

'তাহলে কী করবো, তোর পা ধরে মাফ চাই!'

'হ্যাঁ, আমি সেটাই চাইছি।' লোপা একটু পিছিয়ে আসে, 'ধর, দুই পা একসঙ্গে ধর।'

শোয়েব ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বলে, 'তুই আস্ত একটা পাগল।'

'আর তুই ?'

'আমিও পাগল।'

হেসে ফেলে লোপা। সঙ্গে সঙ্গে শোয়েব ওর হাত ধরে বলে, 'একটা ইন্টারেস্টিং গল্প পড়ছিলাম।'

'কার ?'

'কার আবার, রবি ঠাকুরের।'

'অ।'

'হতাশ হলি বোধহয়।'

'না, হতাশ হইনি। নিজের ভুলের জন্য আফসোস করলাম।' লোপা দরজা বন্ধ করতে করতে বলে, 'তুই কিছু পড়বি আর সেটা রবীন্দ্রনাথের হবে না, এটা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।'

'খুব ভালো গল্প রে।'

'জানি। তা তুই একা যে ? আর সবাই কোথায় ?'

'জাহিদ এসেছে।'

'কোথায় ?'

'ডিম কিনতে গেছে। ওর নাকি ডিম ভেজে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে।'

দরজায় আবার শব্দ হয়। শোয়েব সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলে, 'ওই এলো বোধহয়।'

ঘরের ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা বেজে ওঠে জাহিদের। বাটনটা টিপেই মুখটা হাসি হাসি করে বলে, 'ও, মুমু! হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এখন বাইরে! আমার এক আমেরিকান বন্ধু এসেছে আজ সকালে, ওর সঙ্গে পিজা হাটে বসে পিজা খাচ্ছি আর গল্প করছি। কী বললে ? তুমি পিজা হাটের আশপাশেই আছো, আসতে চাইছ ? না না, এসো না, আমরা এখনই বের হয়ে যাবো। হ্যালো... হ্যালো... তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না মুমু, এখানে নেটওয়ার্কের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে, হ্যালো... হ্যালো...।'

দরজার দিকে শব্দ হতেই ফিরে তাকায় টুসী। কপালটা কুঁচকে ফেলে সে সঙ্গে সঙ্গেই। টোটন আর টুনি ঘরে ঢুকেছে। প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে টুসী ওদের দিকে তাকায়, 'ঘরে ঢুকেছিস কেন ?'

'একটা প্রয়োজন আছে।' টোটন বলে।

'তবে প্রয়োজনটা আমাদের না।' টুনি বলে।

'প্রয়োজনটা তাহলে কার ?' টুসী বলে।

'কার আবার!' টোটন একটু এগিয়ে আসে, 'তোমার।'

'আমার!'

'হ্যাঁ, তোমার।' টুনিও একটু এগিয়ে আসে, 'সে জন্যই তোমার ঘরে ঢুকেছি।'

'ঘরে ঢোকার আগে আমার অনুমতি নিয়েছিস ?'

'না।' টোটন কিছুটা গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে, 'কারণ আছে।'

'কী!' টুসী শব্দ করে বলে, 'কারণ আছে ?'

'হ্যাঁ।' টুনি ওর হাতে পরা চুড়িগুলো চোখের সামনে এনে দেখতে থাকে।

'কারণ-টারণ যা-ই থাক, তোদের বলেছি না, রাতে ঘরে ঢুকতে হলে আমার অনুমতি নিতে হবে!'

'স্যরি আপু, ভুলে গেছি।' টোটন বলে।

'স্যরি আপু, আমিও ভুলে গেছি।' টুনি বলে।

দুজন ঝট করে ঘুরে দাঁড়ায়, আবার ঘরের বাইরে চলে যায় ওরা।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে টুসী বইয়ের দিকে চোখ ফেরাতেই চমকে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। দরজায় শব্দ হচ্ছে, খট্ খট্ করে শব্দ হচ্ছে। টুসী আগের চেয়ে বিরক্ত হয়ে বলে, 'কে ?'

'আপু আমরা।' টোটন বলে, সঙ্গে টুনিও।

'দরজায় খট্ খট্ করছিস কেন ?'

'ঘরে ঢোকার অনুমতি চাইছি।' টোটন দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে টুসীর দিকে তাকায়।

'মানে অনুমতির জন্য শব্দ করছি।' টুনিও দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দেয়, 'আপু, তুমি কিন্তু ভুল বললে।'

রাগী চোখে টুসী ওদের দিকে তাকায়, 'কী ভুল বললাম ?'

'দরজায় খট্ খট্ করে শব্দ করে, না ঠক্ ঠক্ করে শব্দ করে ?'

'তোর কী মনে হয় ?'

'ঠক্ ঠক্ করে।'

'পণ্ডিত হয়ে গেছিস, না ?'

'এটার জন্য আবার পণ্ডিত হতে হয় নাকি ?'

'থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেবো।'

'আপু, তাহলে ভেতরে আসি ?'

'কেন ?'

'ওখান থেকে আমাকে থাপ্পড় দেবে কীভাবে, আর দাঁতই বা ফেলবে কীভাবে!'

'খুব পেকে গেছিস, না ?'

'আবার ভুল বললে আপু ?'

'আবার ভুল!'

'ভুল না তো কী! মানুষ কি কখনো পাকে ? পাকে তো ফ্রুটস, মানে ফল।' টুনি আঙুল দিয়ে গুনতে থাকে, 'এই যেমন আম পাকে, কাঁঠাল পাকে, জাম পাকে, কলা পাকে, আপেল পাকে, আঙ্গুর পাকে, পেয়ারা পাকে–।'

'এই থামলি!'

'আপু–।' টোটন খুব সতর্ক হয়ে ঘরের ভেতর পা রাখে, 'ব্যাপারটা অন্যদিকে যাচ্ছে।'

টুসী আগের মতোই কপাল কুঁচকে বলে, 'কোন দিকে যাচ্ছে ?'

'সংঘাতের দিকে।'

প্রচণ্ড অবাক করা চেহারা নিয়ে টুসী টোটনের দিকে তাকায়, 'কিসের দিকে ?'

'সংঘাতের দিকে।' টোটন হাসতে হাসতে বলে, 'ওই যে টেলিভিশনের খবরে, সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখা যায় না— দেশ সংঘাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সংঘাতের দিকে।'

'সংঘাত মানে কী, জানিস ?'

'জানবো না কেন, খুব সহজ। টোটন আরো একটু এগিয়ে যায়, 'এই যেমন ধরো, তুমি টুনিকে থাপ্পড় মারার জন্য এগিয়ে এলে।'

'আর আমিও তোমার কাছ থেকে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলাম।' টুনি টুসীর দিকে তাকায়, 'ঠিক তখনই প্রচণ্ড রাগ হলো তোমার।'

'এবং সেই রাগে তুমি তোমার অভ্যাসবশত একটা গ্লাস ছুড়ে মারলে মেঝেতে।' টোটন অঙ্ক বোঝানোর মতো বোঝাতে থাকে টুসীকে, 'গ্লাসটা ভেঙে গেলো এবং গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের মতো কাচের গ্লাসের একটা টুকরো এসে তোমার পায়ে আঘাত করলো।'

'আর ওদিকে আমিও দৌড়াতে গিয়ে একটা কিছুর সঙ্গে লেগে ব্যথা পেলাম।' মুচকি হাসে টুনি, 'সঙ্গে সঙ্গে আমারও রাগ হলো। হরতালের সময় রাজনীতিবিদরা যেমন গাড়ি ভাঙে, আমিও আমার অভ্যাসজনিত তোমার ফুলগাছের টবগুলো টপাটপ ভাঙতে লাগলাম।'

'আর তাতেই শুরু হয়ে গেলো সংঘাত।' অভিজ্ঞ হেডমাস্টারের মতো মাথা ঝাঁকায় টোটন, 'ক্লেয়ার ?'

'কিন্তু সব চক্রান্তকে রুখে দিয়ে আমরা সে পথে যাইনি।' টুনি খুক্ খুক্ করে সামান্য কেশে গলাটা গম্ভীর করে বলে, 'আপু, আমরা কি আমাদের আগের জায়গায় যেতে পারি ?'

'কোন জায়গাটায় ?'

'ওই যে আমরা তোমার একটা প্রয়োজনে বিনা অনুমতিতে তোমার ঘরে প্রবেশ করেছিলাম।'

'বল, কোন প্রয়োজন ?'

'ঠিক প্রয়োজন না।' টোটন ওর এক হাত দিয়ে আরেক হাত চুলকানোর ভঙ্গিতে বলে, 'আসলে একটা জিনিস জানতে চাইছি আমরা।'

'বল।'

টুনি খিলখিল করে হাসতে গিয়েই থেমে গিয়ে বলে, 'তোমার কি আজ জন্মদিন ?'

ভ্রূ কুঁচকে ওদের দিকে তাকায় টুসী, 'তোরা জানলি কী করে!'

টোটন কোনো জবাব না দিয়ে দ্রুত আবার ঘরের বাইরে যায় এবং কদম ফুলের একটি তোড়া নিয়ে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে ঘরে ফিরে এসে বলে, 'কে যেন এই তোড়াটি নিচের গেটের দারোয়ানকে দিয়ে তোমার নাম বলেছে।'

গম্ভীর মুখে তোড়াটি হাতে নেয় টুসী। বেশ কিছুক্ষণ কী যেন দেখে সে তোড়ার মাঝে। তারপর হাত দিয়ে ইশারা করে ওদের চলে যেতে বলে। দরজা বন্ধ করে টুসী ওর খাটে এসে বসেই চমকে ওঠে। দরজায় আবার ঠক্ ঠক্ হচ্ছে। টুসী আগের চেয়েও বিরক্ত হয়ে শব্দ করে বলে, 'কে ?'

'আপু, আমরা।' টুনি বলে।

'কী চাস আবার ?'

'ভেতরে এসে বলি ?'

ফুলের তোড়াটি পাশের টেবিলে রেখে দরজাটা খুলে দেয় টুসী। সঙ্গে সঙ্গে দুটো গোলাপ ফুল এগিয়ে দেয় টুনি আর টোটন, 'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ, আপু।'

ফুল দুটো না নিয়ে চোখ দুটো বড় করে টুসী বলে, 'এই ফুল পেলি কোথায় তোরা ?'

টোটন সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে বলে, 'এই শুভ সময়ে এ প্রশ্নটার উত্তর দিতে চাইছি না আপু।'

'কেন ?'

'তাহলে ব্যাপারটা আবার সংঘাতের দিকে যেতে পারে।' টুনি কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করে বলে।

'আর সংঘাতটা এ মুহূর্তে মোটেই শোভনীয় হবে না আপু।' টোটনও কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করে।

'তবু আমি শুনতে চাইছি।'

টোটন টুনির দিকে তাকায়, টুনিও টোটনের দিকে তাকায়। দুজন দুজনকে ইশারা করে। কিন্তু কথাটা টুনিও বলে না, টোটনও বলে না।

'কী হলো, বল!' টুসী কিছুটা রেগে যায়।

'বলছি।' টোটন একটু সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'তুমি কালকে ফুলসহ যে গাছটা কিনে এনেছো, সে গাছ থেকে ছিঁড়ে এনেছি।'

'কী!'

'আপু, তুমি কিন্তু রেগে যাচ্ছো।' টোটন একটু পিছিয়ে আসে।

'তুমি কিন্তু সেই সংঘাতের দিকেই যাচ্ছো।' পিছিয়ে আসে টুনিও।

টুসী ওদের দিকে এগিয়ে যেতেই থেমে যায়। ওরা দৌড়ে পালিয়েছে। তার চেয়েও বড় ব্যাপার, দেয়ালঘড়িতে রাত বারোটা বাজার ঢং ঢং শব্দ হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠেছে মোবাইলটা।

কপালটা আবার কুঁচকে ফেলে টুসী। দরজাটা বন্ধ করে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় মোবাইলটার দিকে। মোবাইলটা বেজেই চলেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটা হাতে নিয়ে বাটনটা চেপে কানের কাছে ধরে, 'হ্যালো।'

'হ্যালো।' ওপাশ থেকে একই শব্দ হয়।

'কে বলছেন ?'

'পরিচিতরা আমাকে ডাকে মৃদুল বলে।'

'ও, আপনি! আমার মোবাইল নাম্বারটাও জেনে ফেলেছেন!'

'হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।'

'মানে ?'

'আমি আপনার জন্মদিনে উইশ করছি।'

'তার মানে ফুলগুলো কি আপনি পাঠিয়েছেন ?'

'স্যরি, আপনার পছন্দের ফুলগুলো পাঠাতে পারিনি বলে। সুনীলের মতো দুরন্ত ষাঁড়ের চোখে লাল কাপড় না বাঁধি, শ্রাবণের এই বর্ষণে ঘর হতে বের হয়েছি অনেক আগেই; বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে ১০৮টি নীল পদ্ম না আনতে পারি, সারা শহর চষে এনেছি চব্বিশটি কদম। আপনি আজ চব্বিশে পা দিলেন বলে, চব্বিশটি বসন্ত আপনাকে ছুঁয়েছে বলে, আর আনন্দে সারা রাত কারো ঘুম হবে না বলে।' মৃদুল একটু থেমে কী যেন ভাবে, তারপর আবার বলে, 'আচ্ছা, কাল সারাটা দিন কীভাবে কাটবে আপনার ?'

'কীভাবে কাটলে ভালো হয় আপনার ?'

'সে ভালো হওয়াটায় কি আপনি অংশীদার হবেন ?'

'আমি রাখি।'

'কেন ?'

'ঘুম পাচ্ছে।'

'কেউ একজন আমার হাতটা ধরো, কপালে হাত রাখো, হাত রাখো গালে-চিবুকে, দেখো, আমি আমার প্রিয়ার বিরহে কেমন পুড়ছি।' অদ্ভুত হেসে ওঠে মৃদুল, 'আচ্ছা, আপনি কি জানেন, আপনার কোন জিনিসটা সবচেয়ে সুন্দর ?'

'কোন জিনিসটা ?'

'আমি জানি, কিন্তু বলবো না, অন্তত আজ না।'

খাবারটা মুখে দিতে নিয়েই চিৎকার করে ওঠে জাহিদ, 'স্টপ!'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় সবাই। রোহিত মুখের কাছ থেকে বিরিয়ানি ভর্তি হাতটা সরিয়ে আনে, লোপা কিছু একটা নেওয়ার জন্য তরকারির বাটির দিকে হাত বাড়াতেই থেমে যায়, কিন্তু মুশকিল হয় শোয়েবের। এরই মধ্যে বিরিয়ানির এক লোকমা খেয়ে ফেলেছে ও এবং মুখের ভেতর আরেক লোকমা ঢুকিয়ে ফেলেছে। জাহিদের 'স্টপ' শুনেই থমকে গিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সে এখন জাহিদের দিকে। বিরিয়ানিগুলো এখন মুখ থেকে বের করে আনবে, না গিলে ফেলবে, কিছুই বুঝতে পারছে না। আবার মুখভর্তি বিরিয়ানি থাকার ফলে জিজ্ঞেসও করতে পারছে না কিছু।

জাহিদ আগের চেয়েও চিৎকার করে বলে, 'কিরে গাধা, ওভাবে তাকিয়ে আছিস কেন ?'

হাত দিয়ে ইশারা করে কী যেন বোঝাতে চায় শোয়েব। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে না জাহিদ। ও আরো রেগে গিয়ে বলে, 'কী হয়েছে, বলবি তো!'

শোয়েব আবার হাত নেড়ে কী যেন বোঝাতে চায়, জাহিদ এবারও কিছু বুঝে উঠতে পারে না। সে আবারও চিৎকার করে ওঠার আগেই লোপা হাত চেপে ধরে জাহিদের। তারপর শোয়েবের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কী হয়েছে তোর, গলায় খাবার আটকে গেছে ?'

মাথাটা এদিক-ওদিক দোলায় শোয়েব।

'পানি খাবি ?'

মাথাটা আবার এদিক-ওদিক দোলায় শোয়েব।

'তাহলে ?'

কিছু বলে না শোয়েব। চোখ দুটো বড় করে তাকায় এবার।

জাহিদ শোয়েবের দিকে একটু এগিয়ে আসে, 'কী, খেতে ইচ্ছে করছে না ?'

মাথাটা উঁচু-নিচু করে শোয়েব।

'তাহলে বের করে ফেল।' জাহিদ একটু শব্দ করে বলে।

সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতরের সবগুলো বিরিয়ানি শোয়েব বের করে ফেলে নিজের হাতের ওপর। তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, 'এই হারামি, খাবার খেতে মানা করলি কেন ?'

'অ।' হতাশ শোনায় জাহিদের গলা, 'এই জন্য মুখের ভেতর খাবার নিয়ে বসে ছিলি ?'

'কী করবো ? তুই মানা করলি, আমি ভাবলাম খাবারের মধ্যে বিষ আছে।'

'তার চেয়েও বেশি।' জাহিদ উঠে গিয়ে ওর বিছানার নিচ থেকে একটা পত্রিকার পাতা বের করে আবার এসে বসে। ভাঁজ করা কাগজটা খুলে মেলে ধরে সবার সামনে।

'কী আছে পেপারে ?' রোহিত একটু এগিয়ে আসে সামনের দিকে।

জাহিদ একটা খবরের ওপর আঙুল এনে বলে, 'দেখ, এখানে কী লেখা আছে।'

পত্রিকায় পাতাটা হাত দিয়ে রোহিত পড়তে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে লোপা বলে, এই গাধা, মনে মনে পড়ছিস কেন, জোরে জোরে পড়।'

মামুন একটু সোজা হয়ে বসে, 'পত্রিকায় লিখেছে বিভিন্ন বাস-ট্রেনে ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকা শহরে যতোগুলো মুরগি আসে, তার বিশ পার্সেন্ট মুরগি মারা যায়।'

'তো ?' লোপা রোহিতের দিকে ঝুঁকে আসে।

'কিন্তু সেই বিশ পার্সেন্ট মুরগি কিন্তু ফেলে দেওয়া হয় না।' রোহিত মুখটা হাসি হাসি করে ফেলে।

লোপা ওর চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে বলে, 'তাহলে কী হয় ওই মুরগিগুলো ?'

'ওগুলো তখন মুরগি থাকে নাকি, ওগুলো তখন মুরগির লাশ হয়ে যায়।'

'জানি তো।' লোপা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে যায়, 'তা সে লাশগুলো কোথায় যায় ?'

'বলবো।' রোহিতের চেহারায় দুষ্টু হাসি।

'আহা, বল না!'

'শহরের বিভিন্ন হোটেলে যায়।'

'তারপর ?'

'তারপর আবার কী।' রোহিত পাতাটা ভাঁজ করতে করতে বলে, 'সেগুলো রান্না হয়।'

'অ।' শোয়েব এতোক্ষণ কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সুযোগ পাচ্ছিলো না, 'তাতে আমাদের অসুবিধা কী ?'

'গাধা, খাঁটি রাম গাধা।' জাহিদ শোয়েবের দিক থেকে লোপার দিকে তাকায়, 'তুই তো খাবারগুলো বাইরে থেকে কিনেছিস, না ?'

'হ্যাঁ, বিরিয়ানি হাউস থেকে কিনেছি।' লোপা শিরদাঁড়া সোজা করে বসে, 'বিরিয়ানির জন্য বিখ্যাত তো দোকানটা।'

'হুম্।' কী যেন একটা চিন্তা করে জাহিদ, 'তুই বিরিয়ানি কিনেছিস পাঁচ প্যাকেট, আস্ত মুরগির রোস্টও এনেছিস পাঁচটা।'

'হ্যাঁ, পাঁচ প্যাকেট বিরিয়ানি আর পুরো মুরগির পাঁচটি রোস্ট।'

'ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল ?' জাহিদ লোপার দিকে উৎসুক চোখে তাকায়।

'ব্যাপারটা আবার কী ?'

'বোকা।' জাহিদ রোহিতের দিকে ফিরে তাকায়, 'তুই কিছু বুঝতে পেরেছিস ?'

'একটু একটু।' না বোঝার মতো করে রোহিত বলে।

'একটু একটু মানে ?' রোহিতের ওপর কিছুটা রেগে যায় জাহিদ, 'তুইও দেখি গাধা হয়ে গেছিস ?' একশটা মুরগির মধ্যে বিশটা মারা গেলে হিসাবমতে পাঁচটার মধ্যে কয়টা মারা যাবে, বল তো দেখি ?'

রোহিত হিসাব করে জাহিদের দিকে গম্ভীর মুখে তাকায়, 'একটা।'

'লোপা কয়টা মুরগির রোস্ট এনেছে ?'

'পাঁচটা মুরগির।'

'এবার বল, এই পাঁচটা মুরগির মধ্যে কোন মুরগিটা মরা ছিল ?'

'কী বলছিস এসব!' রোহিত কপাল কুঁচকে ফেলে।

'কেন, বুঝতে পারছিস না ?' জাহিদ সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে আয়েশ করে বসে, 'পাঁচটা মুরগির মধ্যে একটা মারা গেলে, এখানকার পাঁচটা মুরগির মধ্যে একটা তো অবশ্যই মরা মুরগি আছে, ঠিক কি না ?'

রোহিত আস্তে আস্তে মাথা ঝাঁকিয়ে আস্তে করে বলে, 'ঠিক।'

'কিন্তু কোন মুরগিটা, বল তো ?'

'আমি কী করে বলবো ?'

'আমি কিন্তু জানি।'

'বল কোন মুরগিটা ?'

জাহিদ কিছুটা বিজ্ঞের মতো বলে, 'শোয়েবের মুরগিটা।' শোয়েবের দিকে তাকায় জাহিদ, 'কী ঠিক না শোয়েব ?'

গলার কাছে হঠাৎ হাত নিয়ে চেপে ধরার ভঙ্গিতে শোয়েব বলে, 'সম্ভবত ঠিক। আমি তো আমার মুরগি থেকে একটু টুকরো মাংস খেয়েছি। কেমন যেন লাগছে আমার।'

লোপা অস্থির হয়ে যায়, 'কেমন লাগছে শোয়েব ?'

শোয়েব কিছু বলতে নেয়, কিন্তু তার আগেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে— কক্ কক্।

'এই শোয়েব, এমন করছিস কেন ?' লোপা শোয়েবের একটা হাত জাপটে ধরে।

আবার কথা বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু শব্দ হয়— কক্ কক্।

'এই শোয়েব—।' কান্না কান্না চেহারা করে ফেলে লোপা, 'কক্ কক্ করছিস কেন ?'

'কক্ কক্ করবে না ?' জাহিদ গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে, 'সাধারণত যে মরা মুরগি খায় তার ওপর নাকি সেই মরা মুরগির আৰা ভর করে। দুই থেকে তিন ঘণ্টা সে কোনো কথা বলতে পারে না। সে তখন শুধু কক কক করে।'

জাহিদের মোবাইলটা বেজে ওঠে। রিসিভ বাটনটা চেপেই জাহিদ মুখটা হাসি হাসি করে, 'মুমু, একটা কথা বলব ?'

ওপাশ থেকে মুমু বলে, 'বলো।'

'সত্যি করে বলবে তো ?'

'আহা বলোই না!'

'তুমি কখনো মরা মুরগি খেয়েছ ?'

'কি!'

'মরা মুরগি।' জাহিদ মোবাইলটা বাঁ থেকে ডান কানে এনে বলে, 'মরা মুরগি, আই মিন ডেড হেন। ওই যে বিভিন্ন জায়গা থেকে খাঁচায় করে ঢাকা শহরে মুরগি আসে না ? সেখানে একশটা মুরগির মধ্যে বিশটা মুরগি মারা যায় এবং সেগুলো একসময় রান্না হয় বিভিন্ন হোটেলে। শুধু রান্না না, রোস্ট, চিকেন গার্লিক, আরো অনেক কিছু হয়। আচ্ছা, তুমি তো চিকেন গার্লিক খুব পছন্দ করো এবং প্রায় দিনই খাও।'

'হ্যাঁ, একটু আগেই তো খেয়ে এলাম।'

'বলো কি!' জাহিদ কিছুটা অবাক হওয়ার ভান করে, 'এখন কেমন লাগছে ?'

মুমু হঠাৎ ওয়াক্ ওয়াক্ করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে জাহিদ বলে, 'কী হয়েছে মুমু ?'

মুমু কিছু বলে না। একটু পর জাহিদ শুনতে পায়— কক্ কক্।

'এমন করছো কেন মুমু ?'

ওপাশ থেকে শোনা যায়— কক্ কক্।

মারুফ অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর শেষে বেশ ইতস্তত করে বলে, 'তোমরা কি আমাকে এবার সত্যি সত্যি সাহায্য করবে ?'

টোটন মারুফের দিকে অবাক চোখে তাকায়, 'এটা আপনি কী বললেন ভাইয়া ?'

'কেন, কী বললাম ?' ভীষণ শঙ্কিত শোনায় মারুফের গলা।

'আপনি সত্যি সত্যি সাহায্য করার কথা বললেন।' টোটনকে অসম্ভব অভিমানী মনে হলো, 'ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেলো না ?'

'কেমন হয়ে গেলো ?' মারুফ কেমন যেন কাতর হয়ে যায়।

টোটন কী একটা বলতে নেয় কিন্তু টুনি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আমরা কি এতো দিন তাহলে মিথ্যা মিথ্যা সাহায্য করেছি ?'

'না না, আমি সেটা বলিনি।' মারুফের সারা মুখে অপরাধ ফুটে ওঠে, 'আমি স্যরি টোটন, আমি স্যরি টুনি। আমি আমার কথা উইথড্র করে নিচ্ছি।'

'ওকে, মারুফ ভাইয়া।' টোটন গম্ভীর গলায় কথাটা বলে টুনির দিকে তাকায়, 'তুই কী বলিস টুনি ?'

'আসলে বলতে চাইলে অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু আমি আসলে কিছুই বলবো না।' টুনিও গম্ভীর হয়ে বলে কথাটা।

মারুফের গলা আরো বেশি কাতর শোনায়, 'কেন বলবে না টুনি ?'

'না, ভাবছি আপনাকে কাজটা করে দেওয়ার পরই কথা বলবো।' টুনি টোটনের দিকে তাকায়, 'তুই কী বলিস টোটন ?'

'সেটাই বোধহয় ভালো হবে।' টোটন মাথাটা ঝাঁকিয়ে বুদ্ধিজীবী ঢঙে বলে, 'আগে কাজ পরে কথা।'

'না না টোটন, তোমরা এটা কোরো না।' মারুফ টোটনের দিকে ঝুঁকে আসে, 'আমি তাহলে এতো দিন কী করবো, কার সঙ্গে কথা বলে সময় কাটাবো!'

'ভাইয়া, আপনি ধৈর্যহারা হবেন না।' টুনি মারুফের একটা হাত ধরে বলে, 'আমরা আপনার পাশে আছি।'

'সে জন্যই তো আমি তোমাদের এতো ভালোবাসি।' হাসি হাসি মুখ করে মারুফ একবার টোটনের দিকে, আরেকবার টুনির দিকে তাকায়।

'ভাইয়া, আপনাকে একটা কথা বলি।' টুনি লাজুক কণ্ঠে বলে।

'বলো বলো। একটা কেন, যতো ইচ্ছে বলো।'

'আপনি এতো ভালো কেন ভাইয়া ?' টুনি ওর চোখ দুটো ছলছল করার চেষ্টা করে।

'কেমন করে আপনি এতো ভালো হতে পারলেন ?' টোটনও ওর চোখ দুটো ছলছল করার চেষ্টা করে।

'আমরা যতোই আপনাকে দেখছি, ততোই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।' টুনি মুগ্ধ চোখে মারুফের দিকে তাকায়।

'আমার ভালোটা কেবল তোমরাই দেখলে, আর কেউ দেখলো না।' মারুফ বেশ অভিমানী হয়ে ওঠে।

'আপনি কিন্তু এবার সত্যি সত্যি ধৈর্যহারা হয়ে যাচ্ছেন ভাইয়া।' টোটন সান্ত না দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে।

'স্যরি, আমি আবারও স্যরি।'

'ও, ভালো কথা।' টুনি টোটনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ভাইয়াকে তো ওই কথাটা বলা হলো না।'

'কোন কথাটা ?' মারুফ সোফার একপাশ থেকে খুব দ্রুত অন্যপাশে চলে আসে।

'কথাটা বাসার ভেতর বলতে একটু সমস্যা হবে।' টোটন গলাটা খাদে নামিয়ে বলে, 'আপু শুনতে পেলে আমাদের পিটিয়ে লম্বা করে ফেলবে।'

'তাহলে আমাদের বাসায় চলো ?'

'আপনাদের বাসায়ও বলা যাবে না।'

'কেন ?'

'বাসায় খালাম্মা আছে না ? উনি শুনতে পেলে আপুকে বলে দেবেন, আপু তাহলে আমাদের বেশি করে পিটিয়ে বেশি করে লম্বা করে দেবে।'

'তাহলে উপায় ?'

ডান হাতের একটা আঙুল দাঁত দিয়ে চেপে ধরে কিছুক্ষণ ভাবে টোটন। তারপর গলাটা আগের মতোই খাদে নামিয়ে বলে, 'আমরা তাহলে বাইরে কোথাও যেতে পারি।'

'মানে বাইরে গিয়ে আমরা কোথাও বসতে পারি।' টুনিও চাপা গলায় কথাটা বলে।

'খুব ভালো আইডিয়া।' মারুফ একটু হেসেই মুখটা গম্ভীর করে ফেলে, 'কিন্তু তোমাদের মা, মানে খালাম্মা যেতে দেবেন তো ?'

'কেন দেবে না ?' টুনি বেশ আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে বলে।

'তাহলে চলো।'

'তার আগে মাকে একটু বলে আসি।' টোটন একটু এগিয়ে গিয়েই ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমরা কতোক্ষণ বাইরে থাকবো ভাইয়া ?'

'তোমাদের যতোক্ষণ ইচ্ছে।'

বাসার বাইরে এসেই টোটন কিছুটা গম্ভীর গলায় বলে, 'কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো ভাইয়া ?'

'তোমরাই বলো, তোমরা কোথায় যেতে চাও।'

'আসলে এ কথাটা খুব জরুরি।' টুনি কপালটা কুঁচকে বলে, 'যদিও আগের কথাটাই এখনো বলা হয়নি। তবু পরের কথাটা আমরা আজকেই আপনাকে বলবো।'

'হ্যাঁ, বলাটা আজকেই উচিত।' টোটনকে বেশ আগ্রহী দেখায়।

'খালি উচিত না, বলা যায় একেবারে পবিত্র দায়িত্ব।' টুনি টোটনের দিকে তাকায়।

'কথাটা কি খুবই জরুরি ?' মারুফের চেহারাটা কেমন যেন সাদা হয়ে যায়, 'কথাটা শুনে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে না তো ?'

'আপনার মন খারাপ হবে না, তবে কথাটা শুনে আমাদের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।'

'কেন ?'

'সেটাই তো বলবো আপনাকে।'

'চলো, আমরা ধানমন্ডি লেকের পাশে যাই।'

'সেটা তো অনেক দূরে।'

'দূর হয়েছে তাতে কি, আমরা ক্যাবে করে যাবো।'

'ব্ল্যাক ক্যাবে ?'

'না, ইয়েলো ক্যাবে।'

'সেটাই ভালো।' টোটন মুচকি হেসে বলে, 'একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো, সেটা কালো গাড়িতে না চড়ে হলুদ গাড়িতে চড়েই ভালো।'

'তাতে মনে বড় আনন্দ লাগবে।' টুনি বলে।

'আবার মাথা ঠাণ্ডা রেখেও যাওয়া যাবে।' টোটন বলে।

'ফলে ঠাণ্ডা মাথায় ঠাণ্ডাভাবে কথাটা বলা যাবে।' টুনি আবার বলে।

মারুফ একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'তাহলে একটা ইয়েলো ক্যাব ডাকি।'

সঙ্গে সঙ্গে টোটন বাধা দিয়ে বসে, 'ছি ছি ভাইয়া, আপনি ডাকবেন কেন, আমরা ডাকি।'

'হ্যাঁ, আমরা ডাকি।' টুনি বেশ উৎসাহী হয়ে বলে, 'ক্যাবের ভাড়াও আপনি দেবেন আবার ক্যাবও আপনি ডেকে আনবেন, তা কি হয় ?'

'না না, কোনো অসুবিধা নেই, আমিই ডেকে আনছি।'

'না না ভাইয়া, আমরা ডেকে আনছি।'

কিন্তু কাউকেই ডাকতে হলো না। ওদের দেখেই একটা খালি ইয়েলো ক্যাব সামনে এসে পড়ে। টুনি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বলে, 'ধানমন্ডি লেকে যাবেন ?'

ধানমন্ডি লেকের পশ্চিম পাশে বসেই টোটন হাসতে হাসতে বলে, 'জানেন ভাইয়া, কাল রাতে না টুসী আপু একটা স্বপ্ন দেখেছে।'

'তাই নাকি!' মারুফ বেশ উৎসাহী হয়ে বলে, 'তা কী দেখেছে ?'

'টুসী আপু যদিও অন্য কাউকে বলতে নিষেধ করেছে...।'

'তবু আমরা বলবো।' বাধা দিয়ে বলে ওঠে টুনি, 'আজকেই বলবো।'

'টুসী কেন নিষেধ করেছে ?' মারুফ দুঃখী দুঃখী গলায় কথাটা বলে।

'ব্যাপারটার সঙ্গে আপনি জড়িত তো...।' টোটন মারুফের দিকে সরাসরি তাকায়, 'সে জন্য।'

'আমি জড়িত।' কিছুটা লাফ দিয়ে ওঠে মারুফ, 'তোমরা এটা কী বলছো ?'

'আমরা মিথ্যে বলছি না ভাইয়া।' টোটন মারুফের একটা হাত ধরে।

'একশ পার্সেন্ট সত্য বলছি ভাইয়া।' টুনি মারুফের আরেকটা হাত ধরে।

'তোমাদের কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন লাফাচ্ছে।' টোটন ও টুনির দুটো হাত মারুফ তার বুকের সঙ্গে ঠেকায়।

'বুকের ভেতর কে লাফাচ্ছে ভাইয়া ?' টুনি মারুফের হাত থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয়।

'জানি না।' মারুফ বেশ লজ্জা পায়।

'আমি কিন্তু জানি ভাইয়া কে লাফাচ্ছে।' টোটনের সারা মুখে দুষ্টু হাসি।

মারুফ অস্ফুট স্বরে বলে, 'কে ?'

মারুফের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে টোটন চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে বলে, 'টুসী আপু।'

দু ঠোঁটের মাঝে মিষ্টি একটা হাসি ভেসে ওঠে মারুফের, কিছুক্ষণ সে সেভাবে হাসতেই থাকে। শেষে কিছুটা গদগদ হয়ে বলে, 'এবার বলো তো, টুসী আমাকে নিয়ে কী স্বপ্ন দেখেছে ?'

'স্বপ্নটা খুব মিষ্টি।' টোটন মারুফের দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে।

'মানে স্বপ্নের মধ্যে মিষ্টির ব্যাপারটাই বেশি।' টুনিও হাসতে থাকে।

'বলা যায় টোটাল স্বপ্নটাই মিষ্টিতে ছড়াছড়ি।' টোটন টুনির দিকে তাকায়, 'তাই না টুনি ?'

'তো আর বলছি কি।' টুনি মারুফের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপু স্বপ্ন দেখেছে, আপনি আর আপু মিলে একসঙ্গে আইসক্রিম খাচ্ছেন।'

'একটু পর আবার ফালুদাও খেয়েছেন।' টোটন বলে।

'আমরা একসঙ্গে বসে খাচ্ছিলাম ?' আবার মারুফের গলা জড়িয়ে আসে।

'হ্যাঁ, একসঙ্গেই তো। টেবিলের একপাশে আপনি, অন্যপাশে আপু।' টোটন টুনির দিকে তাকায়, 'তাই না রে টুনি ?'

'অবশ্য আপু আপনার পাশে বসতে চেয়েছিল, কিন্তু...।'

'কিন্তু...।' টুনির কথা শেষ হওয়ার আগেই মারুফ বলে, 'কী ?'

'আপনি নাকি লজ্জায় বসতে চাননি।'

'লজ্জার ব্যাপারই তো।' মারুফ শরমিন্দা মুখে বলে, 'যে মেয়ের সঙ্গে কোনো দিন কোনো কথা বলিনি, একটু হাই-হ্যালো করিনি, তার পাশে বসতে লজ্জা লাগবে না!' মারুফ মুখটা লাল করে বলে, 'তারপর ?'

'আইসক্রিম এবং ফালুদা খাওয়ার পর আপু চলে আসতে চেয়েছিল বাসায়, কিন্তু আপনি নাকি আসতে দেননি।' টুনি মুচকি মুচকি হাসতে থাকে।

'কেন আসতে দিইনি ?'

'তারপর আপনি আপুকে জোর করে চকলেট মিল্ক খাইয়েছেন।'

'চকলেট মিল্কের পর আবার ভুটানের একটা ম্যাংগো জুসও খাইয়েছেন।' টোটন আলতো করে নিজের জিভ চেটে নেয়।

'টুসীকে আমি এতো জিনিস খাইয়েছি!' শব্দ করে হেসে ওঠে মারুফ, 'আমার বড্ড ভালো লাগছে।'

'কিন্তু সকালে উঠে আপু যখন এতো কিছু খাওয়ার কথা বলল, তখন আমাদের মন খারাপ হয়ে গেলো।' টুনি কথাটা বলে আর মাথা উঁচু-নিচু করে সে কথায় সম্মতি জানায় টোটন।

'কেন কেন ?' বেশ উদ্বিগ্ন দেখায় মারুফকে।

'আইসক্রিম, ফালুদা, চকলেট মিল্ক, জুস কেবল আপনারাই খেলেন, আমরা খেতে পারলাম না।' দুঃখী দুঃখী গলায় টোটন বলে।

'মানে আপনারা আমাদের সঙ্গে নিলেন না।' টুনির গলাও দুঃখী দুঃখী শোনায়।

'তোমাদের খেতে ইচ্ছে করছে ?' মারুফ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'চলো, তোমাদেরকে এখনই আমি সবকিছু খাওয়াবো।'

'না না, দরকার নেই ভাইয়া।' বলতে বলতে টোটন উঠে দাঁড়ায়।

'টোটন ঠিকই বলেছে।' টুনিও উঠে দাঁড়ায়, 'একদম দরকার নেই।'

'না না, চলো।' মারুফ দুজনকে দু হাত দিয়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে যায়, 'তোমরা অবশ্যই সবকিছু খাবে।'

টোটন বেশ লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'এটা কি ঠিক হবে ভাইয়া ?'

'কেন ঠিক হবে না ?' মারুফ বেশ উৎসাহী হয়ে বলে, 'আমরা আইসক্রিম, চকলেট মিল্ক, ফালুদা, জুস খেলাম, কিন্তু তোমরা খেতে পারলে না, তা কি হয়, হওয়া উচিত ?'

টোটন একবার টুনির দিকে তাকায়, টুনিও টোটনের দিকে তাকায় এবং দুজন প্রায় একসঙ্গে বলে, 'আপনি যা ভালো মনে করেন।' কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর দুজন আবার একসঙ্গে বলে, 'আচ্ছা ভাইয়া, আপনি এতো ভালো কেন ?'

বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে টুসী বেশ রেগেমেগে বলে, 'কোথায় গিয়েছিলি তোরা ?'

'অনেক দিন কোথাও বেড়াতে যাই না, তোমরাও আমাদের বেড়াতে নিয়ে যাও না, তাই বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা।'

'কোথায় গিয়েছিলি ?'

'ধানমন্ডি লেকে।'

'এতো দূর!' টুসী চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, 'কার সঙ্গে গিয়েছিলি তোরা ?'

'মারুফ ভাইয়ার সঙ্গে।'

'মারুফটা আবার কে ?'

'ওই যে উপরতলার...।'

'ও, উপরতলার ওই গাধাটা!' টুসী কিছুটা রেগে বলে, 'আমাকে বলে গেলি না কেন ?'

'তুমি তো তখন ঘুমাচ্ছিলে। আর মাও তো বাসায় ছিল না, শপিংয়ে গিয়েছিল।'

'তোদের এতো বড় সাহস!'

'এতে সাহসের কী দেখলে আপু, আরেকটু বড় হলে তো আমরা একা একাই বাইরে যাবো।'

টুসী ওর ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই আবার ঘুরে দাঁড়ায়, 'তোদের জামার সঙ্গে কী লেগে আছে ?'

টোটন আর টুনি দুজনই মাথা নিচু করে নিজেদের জামার দিকে তাকায়। তারপর হাসতে হাসতে টোটন বলে, 'মারুফ ভাইয়া আমাদের আইসক্রিম, ফালুদা, চকলেট মিল্ক, জুস খাইয়েছে।'

'তোরা খেলি কেন ?'

টুনি গম্ভীর গলায় বলে, 'আমরা খেতে চেয়েছি নাকি ? উনি বললেন, কতো দিন ফালুদা আইসক্রিম খাই না, চলো আজ খাই। আমরা যতোই 'না' করি, উনি ততোই জোর করেন। শেষে রাজি হয়ে গেলাম। ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে না!' টুনি টোটনের দিকে তাকায়, 'তাই না টোটন ?'

টোটন ঘাড়ভাঙা পুতুলের মতো মাথাটা ক্রমাগত উঁচু-নিচু করে, কিছুক্ষণ পর টুনিও টোটনের মতো মাথাটা উঁচু-নিচু করতে থাকে। আর ওদের মাথা উঁচু-নিচু দেখতে দেখতে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয় টুসী।

বুক খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেজা। দেড় ঘণ্টা ধরে পার্কের এই ঘাসের ওপর বসে থাকতে থাকতে সে কেবল একটা কথাই ভেবেছে— জীবনের কোনো কিছুরই মানে নেই। সবকিছুর ফলাফলই শূন্য, স্রেফ শূন্য।

স্কুলে পড়ার সময় অঙ্ক স্যার ক্লাসে একদিন অঙ্ক বোঝাচ্ছিলেন। হঠাৎ ব্ল্যাকবোর্ডে একটা অঙ্ক লিখে তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'অঙ্কটা তোমরা কে পারবে ?'

হাত তুলেছিল ক্লাসের সবাই। স্যার ব্ল্যাকবোর্ডে লিখেছেন– ১০০০০০০০০ x ০ = ?

স্যার আগের মতোই হেসে বললেন, 'আমি জানি, তোমরা সবাই অঙ্কটা পারবে। এবার বলো তো দেখি, এখানে এই ১ কোটিটা কী আর এই শূন্যটাই বা কী ?'

ক্লাসের ফার্স্ট বয় দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, 'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না স্যার।'

শব্দ করে হেসে উঠলেন স্যার, 'বুঝতে পারোনি ?' স্যার একটু থামলেন, 'যদি এই ১ কোটিটা তুমি হও আর এই শূন্যটা তোমার জীবন হয়, তাহলে রেজাল্ট হবে কতো ?'

'কোনো কিছুর সঙ্গে শূন্য গুণ করলে রেজাল্ট তো শূন্যই হয়।' বিজ্ঞের মতো বলল ফার্স্ট বয়।

'রাইট।' স্যার বেশ আনন্দিত হলেন, 'তাহলে তুমি আর তোমার জীবন মিলে যে রেজাল্ট দাঁড়াবে তা হবে শূন্য। তোমরা সক্রেটিসের নাম শুনেছো ? ওই যে বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস ? জীবন নিয়ে তিনি কী বলেছেন জানো– লাইফ ইজ নাথিং।'

বহুদিন পর কথাটা মনে পড়ে রেজার। রেজা মুচকি হাসে এবং এতো দিন পর সত্যি সত্যি জানতে পারে জীবনটা আসলে কিছু না।

সামনের দিকে তাকায় রেজা। দুটো ছেলে এগিয়ে আসছে তার দিকে। একটা ছেলের পিঠে ছালার একটা ব্যাগ, আরেকজনের হাতে ভাঙা একটা ক্রিকেট খেলার ব্যাট। তার একেবারে সামনে এসে ছেলে দুটো অলস ভঙ্গিতে দাঁড়ায়। রেজা মিষ্টি হেসে বলে, 'কিছু বলবে ?'

মাথা এদিক-ওদিক দোলায় দুজনই।

'কিছু খাবে ?'

এবারও কিছুই বলে না ছেলে দুটো, মাথাও দোলায় না।

'তোমরা বসো।'

পিঠ থেকে ছালার ব্যাগটা পাশে রাখে প্রথম ছেলেটি, ভাঙা ব্যাটটাও সামনে রাখে দ্বিতীয় ছেলেটি। তারপর দুজন খুব আয়েশ করে বসে পড়ে রেজার সামনে। রেজা তার কাপড়ের ব্যাগ থেকে দুটো চকলেট বের করে ছেলে দুটোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'নাও।'

হাত বাড়িয়ে দেয় ছেলে দুটোও। চকলেট হাতের মুঠোয় নিয়ে নাড়তে নাড়তে প্রথম ছেলেটি বলে, 'আপনে প্রত্যেক দিন এইখানে আসেন, না ?'

'প্রত্যেক দিন না, মাঝে মাঝে আসি।'

'ক্যান আসেন ?' দ্বিতীয় ছেলেটি বলে।

'কেন আসি ?' রেজা প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করে। সম্ভবত এ প্রশ্নটার উত্তর তার জানা নেই, তাই সে কিছু বলেও না আর। রেজা তার ব্যাগ থেকে আরো দুটো চকলেট বের করে বলে, 'তোমরা কি নজরুলের নাম শুনেছো ?'

'কোন নজরুল, ওই পাও-ভাঙা নজরুল ?'

'না...।'

'তাইলে ওই এক চোখ কানা নজরুল ?' রেজা কিছু বলার আগেই দ্বিতীয় ছেলেটি বলে।

'না...।'

'ও বুঝছি, আপনে তরকারি চোর নজরুলের কথা কইতাছেন।'

'না, আমি আসলে কাজী নজরুল ইসলামের কথা বলছি।'

'সেইডা আবার কেডা ?'

'উনি একজন কবি ছিলেন, মস্ত বড় কবি।'

'কবি কী ?' দ্বিতীয় ছেলেটি আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

'যারা কবিতা লেখে, তাদের কবি বলে।' রেজা ছেলে দুটোকে বোঝানোর ভঙ্গিতে বলে।

'কবিতা লেখে ?' দ্বিতীয় ছেলেটি কিছুটা ইতস্তত করে বলে, 'কবিতা কী ?'

'কবিতা হচ্ছে...।' রেজা এ মুহূর্তে ঠিক বোঝাতে পারে না কবিতা কাকে বলে। কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে সে বলে, 'তোমাদের বরং একটা কবিতা শোনাই। শুনবে ?'

মাথা একদিকে কাত করে দুজনই।

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।

'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হ'ল!'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হ'য়ে যাবে নিশ্চয়!
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ–
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোলো বাবা, খাইনি তো সাত দিন!'
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে!
ভুখারী ফুকারি' কয়,
'ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়!'
মসজিদে কাল শিরণী আছিল,–অঢেল গোস্ত রুটী
বাঁচিয়া গিয়াছে, মোল্লা সাহেব হেসে তাই কুটি কুটি,
এমন সময় এলো মুসাফির গায়ে আজারির চিন
বলে, 'বাবা, আমি ভুখা ফাকা আছি আজ নিয়ে সাত দিন!'
তেরিয়া হইয়া হাঁকিল মোল্লা–'ভ্যালা হ'ল দেখি লেঠা,
ভুখা আছ মর' গো-ভাগাড়ে গিয়ে! নমাজ পড়িস বেটা ?'
ভুখারী কহিল, 'না বাবা!' মোল্লা হাঁকিল– 'তা হলে শালা
সোজা পথ দেখ!' গোস্ত-রুটী নিয়া মসজিদে দিল তালা।
ভুখারী ফিরিয়া চলে,
চলিতে চলিতে বলে–
'আশীটা বছর কেটে গেল, আমি ডাকিনি তোমায় কভু,
আমার ক্ষুধার অন্ন তা ব'লে বন্ধ করনি প্রভু।

অর্ধেক বললাম, তা কেমন লাগলো ?'

হাই তুলতে তুলতে প্রথম ছেলেটি বলল, 'কিছু বুঝি নাই তো।'

'কিছুই বোঝনি ?'

'নাহ্।'

'ঠিক আছে, বুঝতে হবে না। তোমরা কবিতাটি মনোযোগ দিয়ে শুনেছো, সে জন্য তোমাদের দুজনকে দুটো চকলেট।'

'তোমরা কি আরেকটি কবিতা শুনবে ?'

'তাইলে কি আরেকটা চকলেট দিবেন ?' দ্বিতীয় ছেলেটি বলে।

'দেবো।'

'তাইলে বলেন।'

'তার আগে তোমাদের একটা প্রশ্ন করি— বলো তো সুখ কিসে পাওয়া যায় ?'

'সুখ পাওয়া যায় চিকেন বিরানি খাইলে।' ঠোঁট দুটো সামান্য চেটে প্রথম ছেলেটি বলে।

'তুমি কিসে সুখ পাও ?' রেজা দ্বিতীয় ছেলেটির দিকে তাকায়।

'মার কাছে গেলে আমি সুখ পাই।'

ছলছল করে ওঠে রেজার চোখ দুটো, 'তোমার মা কোথায় থাকে ?'

'অংপুরে।'

'রংপুরে ?' কিছুটা অবাক হয়ে যায় রেজা, 'এতো দূরে থাকে!'

'দূর কোনহানে।' হাসতে থাকে দ্বিতীয় ছেলেটি, 'বাসেত উঠলেই তো ছ্যাত কইরা যাওয়া যায়।'

'কতো দিন আগে গিয়েছিলে ?'

'রোজার ঈদত গেছিলাম, আবার রোজার ঈদত যামু।' সারা মুখ হাসিতে ভরে ফেলে ছেলেটি, 'এবার মার লাইগ্যা একটা কাপড় কিনা নিয়া যামু।'

'টাকা পাবে কোথায় ?'

'কামাই করমু।'

বিশটি চকলেট কিনেছিল রেজা। পরপর নয়টি কবিতা শোনার জন্য দুজনকে আঠারটি চকলেট দিয়েছে, আর প্রথমে দুটি এমনি দিয়েছে। কিছুটা ক্লান্ত স্বরে নয়টি কবিতা পড়ার পর রেজা বলে, 'সময়টা কেমন কাটলো তোমাদের ?'

'ভালোই।' দ্বিতীয় ছেলেটি তার ভাঙা ব্যাটটা মাটির সঙ্গে গুঁতো দিয়ে বলে, 'কোনো কাজকাম আছিল না, সময়টা আকামাই কাটতো, এইহানেও আকামাই কাটলো।'

'তোমাদের ভালো লাগেনি কবিতাগুলো ?'

'কেমনে লাগবো।' প্রথম ছেলেটি করুণ মুখে বলে, 'পেটে খিদা থাকলে কোনো কিছু ভালো লাগে না।'

'তাহলে চকলেটগুলো খাচ্ছো না কেন ?'

'চকলেট খাইলে কি প্যাট ভরবো ?' দ্বিতীয় ছেলেটি হাতের মুঠোর চকলেটগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এগুলা বেচুম, তারপর সেই ট্যাকা দিয়া ভাত কিনা খামু।'

'ভালো।' রেজা তার কাপড়ের ব্যাগের ভেতরটা হাতাতে হাতাতে বলে, 'আমার চকলেট শেষ। আমি আর চকলেট দিতে পারবো না। তোমরা কি আর একটা কবিতা শুনবে ?'

ছালার ব্যাগটা হাতে নিয়ে প্রথম ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায় দ্বিতীয় ছেলেটিও।

'কী হলো, তোমরা কোথায় যাচ্ছো ?' রেজা জিজ্ঞেস করে ওদের।

ভাঙা ব্যাটটা মাটিতে জোরে একটা টোকা দিয়ে দ্বিতীয় ছেলেটি বলে, 'সময় তো অনেক নষ্ট করলাম, আর সময় নাই।'

ছেলে দুটোর দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে রেজা। তাদের সময় নাই— কেবল তারই অফুরন্ত সময়, অফুরন্ত অবসর। আপাতত করার নেই কিছুই।

রেজা হঠাৎ চমকে ওঠে। পিঠে আলতো ছোঁয়া পেয়েই পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে লোপা দাঁড়িয়ে আছে। মুচকি মুচকি হাসছে সে। অবাক চোখে রেজা উঠে দাঁড়াতেই লোপা কিছুটা রেগে বলে, 'উঠলি কেন ?'

'লোপা তুই, এই পার্কে!'

'কেন ? পার্কে তুই আসতে পারিস, আমি পারি না ?'

'না, সেটা বলিনি। হঠাৎ এলি তো!'

'তুই এখানে প্রায়ই আসিস, সেটা আমি জানি।'

লোপা ঘাসের ওপর বসে, 'কিছুই ভালো লাগছিল না, তাই তোর সঙ্গে গল্প করতে এলাম।'

'আমি এখানে নাও থাকতে পারতাম।'

'তোকে না পেলে আমি একা একাই বসে থাকতাম এখানে।'

'কেন ?'

'দেখতাম, প্রতিদিন এখানে এসে আসলে কী দেখিস, কী সুখ পাস একা একা বসে থেকে।'

'তোর খুব মন খারাপ, না ?'

'নাহ্।' দীর্ঘশ্বাসের মতো শোনায় লোপার গলা, 'প্রতিদিনের মতোই।'

'একটা জোক্স শুনবি ?'

'হাসির, না জোর করে হাসতে হবে ?'

'প্রচণ্ড হাসির।'

'বল।'

'শিহাবের বাবা-মায়ের খুব ইচ্ছে শিহাব সেনাবাহিনীতে যোগ দিক। কিন্তু সে হতে চায় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার। কথাটা শোনার পর ভীষণ মন-খারাপ করলো বাবা-মা। অগত্যা বাবা-মায়ের মন রক্ষার্থে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য মনস্থ করলো সে।

সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শেষে তার ডাক পড়লো চোখ পরীক্ষার। ঠিক এই সময়টাতে সে আবার তার সিদ্ধান্তটা পরিবর্তন করে ফেললো— সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে না। কিন্তু এখন আর ফিরে আসার উপায় নেই। বাবা-মা আত্মীয়স্বজন সবাই জেনে গেছে শিহাব সেনাবাহিনীর অফিসার হচ্ছে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা চিন্তা করার পর উপায় একটা বের করলো শিহাব– চোখের ডাক্তারকে ভুল কিছু বলতে হবে, যাতে তিনি ভাবেন, চোখে কম দেখে সে।

যেই ভাবা সেই কা । চোখ পরীক্ষার দিন সেনাবাহিনীর ডাক্তারের চেম্বারে যেতেই ডাক্তার দেয়ালে টাঙানো একটা চার্ট দেখিয়ে বললেন, আপনি কি অক্ষরগুলো দেখতে পাচ্ছেন ?

সিহাব বললো, কিসের অক্ষর ?

ওই যে দেয়ালে টাঙানো কাগজটায় কিছু অক্ষর লেখা আছে ?

না, আমি তো অক্ষর-টক্ষর কিছু দেখছি না।

কী বলছেন আপনি! ডাক্তার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বলেন, ওই তো অক্ষর।

স্যরি ডাক্তার, আমি আসলে কিছুই দেখছি না।

ডাক্তার শিহাবকে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার অযোগ্য ঘোষণা করে বিদায় দিলেন।

মনের আনন্দে শিহাব সন্ধ্যার সময় সিনেমা দেখতে গেলো সিনেমা হলে। টিকিটের নম্বর মিলিয়ে সিটে বসেই বাঁ দিকে তাকালো শিহাব। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো— তার পাশে সেই ডাক্তার বসে আছেন, তিনিও এসেছেন সিনেমা দেখতে।

ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেলো সিহাব–ডাক্তার তাকে চিনতে পারবে না তো ?

ডাক্তার সাহেব তাকে ঠিকই চিনতে পারলেন, আরে আপনি! আপনি সিনেমা দেখতে এসেছেন! আপনি তো দূরের জিনিস কিছুই দেখতে পান না।

ভাই, আপনি কে বলছেন ? আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সিহাব অন্ধের মতো সামনে হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমি তো মিরপুরে যাবো, এটা মিরপুরের বাস না ?'

কৌতুকটা শেষ হওয়ার পরও গম্ভীর হয়ে বসে থাকে লোপা। তা দেখে রেজা চোখ দুটো কুঁচকে বলে, 'কিরে, হাসলি না ?'

'না।'

'কেন ?'

'এই সঙ তুই আরো একবার বলেছিলি।'

'তাই নাকি ?' রেজা নিজের দু হাতের তালু পরস্পর ঘসে বলে, 'ঠিক আছে, আরেকটা বলছি— নদীতে গোসল করার সময় একটা ছেলে ডুবে যাচ্ছিল। নদীর পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি ডুবন্ত ছেলেটাকে দেখে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করলেন তাকে এবং পৌঁছে দিলেন তার বাবার কাছে। তার বাবা ছিলেন মহা কৃপণ। সৌজন্যতাবশত একটা ধন্যবাদও দিলেন না ভদ্রলোককে।

পরের দিন সেই মহা কৃপণ চলে এলেন উদ্ধারকর্তা ভদ্রলোকের বাড়িতে এবং এসেই ভদ্রলোককে বললেন, আপনাকে কাল ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি, তাই আজ ধন্যবাদ দিতে এলাম।

না না, ধন্যবাদের কিছুই নেই। মানুষ হিসেবে ছেলেটাকে উদ্ধার করা আমার দায়িত্ব ছিল।

কৃপণ লোকটি এ কথা শুনে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'আসলে আমি ঠিক ধন্যবাদ জানাতে আসিনি। গোসল করার সময় আমার ছেলের হাতে একটা ওয়াটারপ্রুফ ঘড়ি ছিল, ওটা পাওয়া যাচ্ছে না। তা ঘড়িটা কি আপনার কাছে আছে ?'

লোপা এবারও আগের মতোই গম্ভীর হয়ে বসে থাকে। হাঁটুর সঙ্গে থুতনি ঠেকিয়ে অদ্ভুতভাবে বসে আছে সে। সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কী যেন দেখছে। রেজা ওর মাথায় আলতো ছুঁয়ে বলে, 'কিরে, ঘুমিয়েছিস নাকি ?'

সোজা হয়ে বসে ওড়না দিয়ে চোখ দুটো মুছতে মুছতে লোপা বলে, 'না।'

'এই, এই ছেমরি—।' রেজা কিছুটা উত্তেজিত হয়ে যায়, 'তুই কাঁদছিস কেন ?'

'না তো!' লোপা আবার চোখ মোছে, 'কাঁদছি না তো!'

'আমি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি কাঁদছিস, আর বলছিস কাঁদছিস না!' রেজা লোপার একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দেয়, 'তোর কী হয়েছে, বল তো ?'

'কিছুই হয়নি রে।'

'কিছু হয়নি, না ?'

লোপা রেজার হাতটা জড়িয়ে ধরে বলে, 'চল না, আজ অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়াই। তোর কি সময় হবে একটু ?'

মৃদুলের কথাটা অন্তর দিয়ে অনুভব করে টুসী। বুকের ভেতরটা কেমন যেন শান্তও হয়ে আসে। টুসী তবু বলে, 'বুঝলাম না।'

কিছুক্ষণ চুপ থাকে মৃদুল। তারপর কিছুটা সংকোচ নিয়ে বলে, 'সত্যি বোঝেননি ?'

'না, বুঝিনি।'

'আবার বলবো ?'

'না, দরকার নেই।'

কিছুটা শব্দ করে হেসেই আবার স্বাভাবিক হয় মৃদুল, 'আমি স্যরি।'

'কেন ?'

'এই যে এতো রাতে আপনাকে বিরক্ত করলাম!'

'মোবাইল থাকলে এটা সহ্য করতে হয়।'

'বিরক্তটা বুঝি অনেকেই করে ?'

'মেয়েদের মোবাইল তো! নাম্বারটা পেলে অনেকেই গল্প করতে চায়।'

'কখন বেশি চায়— দিনে, না রাতে ?'

'রাতে।'

মৃদুল আবার হেসে ওঠে, 'আমার মতো।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় মৃদুল। কিছুটা ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদটাকে আস্তে আস্তে ঢেকে দিচ্ছে একগুচ্ছ কালো মেঘ। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে মৃদুল পাশের বাসার ছাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটা অবাক করা কথা বলবো আপনাকে।'

'অবাক করা কথা!' কপাল কুঁচকে কথাটা বলেই টুসী বলে, 'বলুন।'

'আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। সাদা পোশাক আপনার দারুণ পছন্দ, আপনি এখন একটা সাদা জামা পরে আছেন।'

'ঠিক।'

'আপনার হাতের নখে সাদা-সোনালি মিশ্রণের নেইল পলিশ লাগানো, কিন্তু সেগুলো শুধু বাঁ হাতে আছে, ডান হাতে নেই।'

'ঠিক।'

'আপনি কপালে টিপ পরতে পছন্দ করেন না, কিন্তু আজ পরেছেন। তবে একটা ভুল হয়ে গেছে।'

'কী ?'

'আপনি টিপটা উল্টো করে পরেছেন। নিচের অংশ ওপরে আর ওপরের অংশ নিচে লাগিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হলো, ব্যাপারটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। আচ্ছা, আপনার ঘরে আয়না আছে ?'

'আছে।'

'আয়নায় আপনার মুখটা দেখবেন একটু ?'

'না।'

'ঠিক আছে।' মোবাইলটা বাঁ কান থেকে ডান কানে আনে মৃদুল, 'আচ্ছা, আপনি এক কানে দুল পরেছেন কেন ?'

'বা রে, আমার কানের দুলও আপনি দেখতে পাচ্ছেন নাকি ?'

'কেন, না দেখতে পাওয়ার তো কিছু নেই!'

'আমার কান দুটো চুলে ঢেকে আছে।'

'ভালো করে দেখুন, কানের নিচের অংশটুকু বের হয়ে আছে।' মৃদুল একটু থেমে বলে, 'আপনি নূপুর পরেছেন, তবে এক পায়ে। আধুনিক স্টাইল বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি হাঁটলে কি নূপুরের শব্দ হয় ?'

'আপনি সব দেখতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন না ?'

'এতো দূর থেকে হয়তো দেখা সম্ভব, কিন্তু কোনো কিছু কি শোনা সম্ভব ?'

'না, আমার নূপুরে শব্দে হয় না।'

'আপনার পায়ের নখগুলো বেশ বড়।'

'অনেকের এর চেয়েও বড় আছে।'

'আমার ভীষণ ভয় লাগে।'

'কেন, এ রকম নখওয়ালা পা দিয়ে কেউ কখনো আঘাত করেছে নাকি ?' খিলখিল করে হেসে ওঠে টুসী।

'না, ভয় হয় হাঁটতে গিয়ে ওরকম বড় বড় নখ কারো সঙ্গে লেগে না আবার উল্টে যায়।'

'না, উল্টে যাবে না। মেয়েরা সাবধানে পা ফেলে।'

কিছুক্ষণ চুপ থেকে মৃদুল বলে, 'জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই ফেলে ?'

'তা তো জানি না!'

'আচ্ছা, আরেকটা কথা বলি ?'

'বলুন।'

'ঠিক ঠিক জবাব দেবেন তো ?'

'চেষ্টা করবো।'

'কদম ফুলগুলো কি ফেলে দিয়েছেন ?'

'ফেলবো না তো ঘরে রেখে পুজো করবো নাকি!'

'আমি জানতাম।'

'কী জানতেন ?'

'ফুলগুলো ফেলে দেবেন আপনি।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে মৃদুল, 'মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানেন ? দূরে কোথাও পালিয়ে যাই।'

'গেলেই তো পারেন, বাধা দিয়েছে কে ?'

'কেউ না।' হতাশার কণ্ঠে মৃদুল বলে, 'বাধা দেয়ার কেউ নেই যে! আচ্ছা, প্রত্যাখ্যানের অনুভূতিটা কী, তা কি জানেন ?'

'না।'

'জানেন না ?'

'প্রত্যাশা কখনো এমন পর্যায়ে নিইনি যে প্রত্যাখ্যান এসে সামনে দাঁড়াবে।'

'এটা একটা মহৎ গুণ— প্রত্যাশার লাগাম টেনে ধরা, প্রত্যাশাকে প্রসারিত করতে না দেওয়া।'

'হয়তো।'

'প্রত্যাখ্যান নিয়ে একটা লেখা পড়েছিলাম অনেক আগে।'

'কার লেখা ?'

'মনে নেই, তবে লেখাটা মনে আছে— প্রত্যাখ্যানের অনুভূতি সব সময় নির্ভর করে আমার প্রত্যাশার ওপর। আমার বিচার-বিশ্লেষণে যদি এটা প্রমাণিত হয়, আমার প্রত্যাশাটা একশ ভাগ সঠিক— তাহলে যে প্রত্যাখ্যান করে, তার প্রতি আমার করুণা হয়।

আর যদি মনে হয়— আমার প্রত্যাশাটাই ভুল, তাহলে সে ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বোধ করি।

ব্যাপারটা যদি মাঝামাঝি হয়— তাহলে প্রত্যাখ্যানকারীর পছন্দকেই মেনে নিই।

তখন আর কোনো অনুভূতি আমার মধ্যে কাজ করে না।

কেমন লাগলো কথাগুলো ?'

'খুব সুন্দর।'

টুসীর দরজায় খট্ খট্ করে শব্দ হয় হঠাৎ। শব্দটা শুনতে পায় মৃদুলও, 'আপনার দরজায় শব্দ হচ্ছে।'

'সম্ভবত মা ডাকছে।'

'আমি তাহলে রাখি।'

'ওকে।'

'কিছু কথা এখনো বাকি রয়ে গেলো যে!'

'অন্য দিন, অন্য কোনো সময়ে।'

'আজ রাতে আমি যদি আপনাকে আরেকবার ডিস্টার্ব করি, তাহলে কি আপনি মাইন্ড করবেন ?'

'কথাগুলো বলা কি খুবই জরুরি ?'

'প্রয়োজন, খুবই প্রয়োজন।'

দরজা খুলেই টুসী কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলে, 'এতো রাতে দরজায় খট্ খট্ করছো কেন ?'

'এমনি, দেখলাম তুই ঘুমিয়েছিস নাকি ?'

'কী দেখলে ?'

'ঘুমাসনি।'

'মা, আমি জানি তুমি কেন এসেছো ?'

'কেন এসেছি ?'

'তুমি জানো না, তুমি কেন এসেছো ?'

'বললাম তো, তুই ঘুমিয়েছিস কি না তা দেখতে এসেছি।'

'দেখেছো তো ? এবার যাও, আমি এখন ঘুমাবো।'

টুসীর বিছানায় বসতে বসতে সোমা চৌধুরী বললেন, 'এলামই যখন, একটু গল্প করি।'

'এখন গল্প করার সময় ?'

'গল্প করার সময়ই যদি না হবে, এতোক্ষণ তাহলে কার সঙ্গে কথা বলছিলি ?'

'সেটা তোমাকে বলতে হবে ?'

'ঠিক আছে, বলতে হবে না।'

'তুমি এখন যাও।'

'আরো একটু বসি।'

'বসতে হবে না। তুমি যে জন্য এসেছো তা করে চলে যাও।'

মিসেস সোমা চৌধুরী বিছানা থেকে নেমে কিছুটা উপুড় হয়ে টুসীর খাটের নিচে তাকান। সেখানটা ভালোভাবে দেখে ওয়ারড্রোবটা পরীক্ষা করে স্টিলের আলমারিটা খুলে ফেলেন। তারপর বারান্দাটা ভালোভাবে দেখে শেষে টুসীর সামনে এসে দাঁড়ান।

'কিছু পেলে ?' বেশ গম্ভীর শোনায় টুসীর গলা।

'না।'

সোমা চৌধুরী চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই আবার ঘুরে দাঁড়ান, 'একটা কথা বলবো তোকে ?'

রাগী চোখে টুসী মায়ের দিকে তাকায়। কিন্তু কিছু বলে না।

'ওভাবে তাকাচ্ছিস কেন ?' সোমা চৌধুরী একটু এগিয়ে আসেন টুসীর দিকে, 'আমি যে এসব করি তা তোদের ভালোর জন্যই করি।'

'তুমি তোমার ভালোটা বোঝো তো ?'

'মানে!'

'মানে কিছু না, তুমি এখন দয়া করে যাও।'

'যদি না যাই ?'

'তাহলে বসে থাকো।' বলেই টুসী পা তুলে ওর বিছানায় গিয়ে বসে। রাগী চোখে সোমা চৌধুরী টুসীর দিকে তাকিয়ে থেকে পা বাড়ান বাইরের দিকে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়ান তিনি। টুসী বিছানা থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়ায়, 'তুমি তো প্রতিদিন রাতে এসে আমার ঘর পরীক্ষা করো, কোনো ছেলে এসে আমার ঘরে লুকিয়ে রয়েছে কি না তা দেখো। এবার একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো— যদি আমি চুপি চুপি কোনো ছেলের ঘরে যেতে চাই, তুমি তা ঠেকাবে কীভাবে ?'

দরজা বন্ধ করে বিছানায় বসার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইলটা বেজে ওঠে আবার। বাটনটা চেপে কানের কাছে এনেই টুসী বলে, 'আবার কেন ?'

'ওই যে, এখনো কথা শেষ হয়নি বলে।'

'দ্রুত শেষ করুন, আমি ঘুমাবো।'

'আজ আকাশ দেখেছেন ?'

'না।'

'আপনার ঘরের জানালা দিয়ে আকাশটা দেখা যায় ?'

'যায়।'

'একটা অনুরোধ করবো ?'

'কী ?'

'আকাশটা একবার দেখবেন ?'

'না।'

'প্লিজ, একবার দেখুন না।'

'দেখে কী হবে ?'

'হয়তো কিছুই হবে না। কারো জন্য আমি রোদ্দুরের কাছে বাজিতে হেরেছি আজ, সে বোঝেনি। আমার অভিমানের মেঘগুলো বৃষ্টি হয়ে ঝরেছে, তবু সে আসেনি। এমন ভুলো মন তার! কষ্টে কষ্টে ভিজে যাই আমি আমার কষ্টমুখরে। এই মন-খারাপ করা নির্জন রাতে একবারও সে ভালোবাসেনি বলে।'

কথা শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ বিছানায় একা একা বসে থাকে টুসী। মৃদুলের দেওয়া কদমগুলো এখন বেশ তাজা রয়েছে। ফ্লাওয়ার ভাস থেকে বেশ মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে এখন।

টুসী বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ায়। ফুলগুলো হাতে নিয়ে একবার গালে ছোঁয়ায়, তারপর সেগুলো হাতে নিয়েই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আকাশে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ ভেসে আছে, মেঘগুলো এখন আর নেই। ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী, পৃথিবীর সবকিছু।

ফ্যালফ্যাল করে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে লোপা, যেন ওদের ও চিনতে পারছে না, কিংবা বিশ্বাস হচ্ছে না ওরা দিব্যি ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে শেষে মাথার চুলগুলো পেছনে টেনে বাঁধতে বাঁধতে লোপা একটা ফ্যাকাসে হাসি দিয়ে বলে, 'তোরা ?'

জাহিদ কিছুটা চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'এতোক্ষণ কী করছিলি ?'

'কই, কিছু না তো!' চোখ দুটো বড় করে ফেলে লোপা।

'কিছু করছিলি না, না ?'

'বললাম তো, কিছুই করছিলাম না। ঘরের ভেতর একা একা কী করব ?'

'ঘরের ভেতর একা একা মানে ?' রোহিত ঘরের ভেতর একটু উঁকি দিয়ে বলে, 'আঙ্কেল-আন্টি কই ?'

'তারা তাদের কাজে বাইরে গেছেন।'

'তাদের কলবেল কতোবার বাজানো হয়েছে তুই শুনেছিস ?' শোয়েব একটু সামনে এগিয়ে আসে।

'না তো, আমি তো এই প্রথমবার শুনলাম!'

'পুরো এগারবার।' জাহিদ লোপার চোখের দিকে তাকায়, 'ঘুমিয়ে ছিলি নাকি ?'

'ঠিক ঘুম না, আধো ঘুম। কোনো কাজকাম নেই তো!'

'অবাক হয়েছিস ?'

'কেন ?'

'এই যে হঠাৎ চলে এলাম।'

'একটু।'

'যদিও তোর বাসায় কখনো তুই আসতে বলিসনি, তবু এলাম। কেমন যেন লাগছে।'

'আমার বাসা ? এটা আমার বাসা ?' দুঃখী দুঃখী একটা হাসি দিয়ে লোপা সবার দিকে একবার তাকায়, 'আয়, ভেতরে আয়।'

ড্রইংরুমের কার্পেটে পা রেখেই ছোট্ট একটা চিৎকার দেয় রোহিত, 'এই লোপা, কার্পেটটা কোথা থেকে কিনেছিস রে, জান্নাতুল ফেরদৌস থেকে ?'

'না, এটা পৃথিবীরই কার্পেট, বাংলাদেশেই এটা তৈরি হয়।'

'কার্পেট এত সবুজ হয়, এত নরম হয় কার্পেটের শরীর, আজই প্রথম দেখলাম, প্রথম জানলাম। সার্থক জনম আমার, সার্থক জনম আমার পায়ের।' কার্পেটের ওপর ধপাস করে বসে পড়ে রোহিত।

লোপা ঘুরে দাঁড়িয়ে একটু এগিয়ে আসে রোহিতের দিকে। তারপর হাঁটু মুড়ে পাশে বসে সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকায়, 'সার্থক জনম তোর— সামান্য একটা কার্পেটে পা রেখেই সার্থক হয়ে গেল তোর জনমটা ?'

'হ্যাঁ, হয়ে গেল।' রোহিত একটু সোজা হয়ে আয়েশ করে বসে, 'যে পা প্রতিনিয়ত পথের ধুলোয় পথ চলে, চামড়া নয় রেক্সিনের জুতো ক্ষয় করে চলে যে পা, ভেঙে যাওয়া রাস্তার উঁচু-নিচু মেপে মেপে যে পা খোঁজে তার আশ্রয়, সেই পা বুক ঠাণ্ডা করা সবুজ এবং কেবলই ঘুম এসে যায় নরম কার্পেটে প্রথম, হ্যাঁ, এই প্রথম পা ফেলেছে, ব্যাপারটা সার্থকতার পর্যায়ে পড়ে না ?'

রোহিতের কাঁধে আলতো করে হাত রাখে লোপা, 'জীবনের সার্থকতা এতো অল্পতে ?'

'যারা কিছুই পায় না তাদের কাছে সামান্য পাওয়াই অনেক।' লোপার হাতটা কাঁধ থেকে নামিয়ে নিজের হাতের মধ্যে আনে রোহিত, 'যাক, এতো কঠিন কঠিন কথা এখন বাদ। এবার বল, গত দু দিন আমাদের ওখানে যাসনি কেন ?'

'শরীরটা ভালো ছিল না রে।'

'শরীর, না মন ?'

'বলতে পারিস দুটোই।' লোপা শোয়েবের দিকে তাকায়, 'আচ্ছা, তুই কি রবীন্দ্রনাথের *বোঝাপড়া* কবিতাটা পড়েছিস ?'

'মনেরে আজ কহো যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যরে লও সহজে।

এটা ?'

'হ্যাঁ।'

'বাকিটুকু শুনবি ?'

'না, আজ থাক।' লোপা উঠতে গিয়েই আবার বসে পড়ে, 'এবার বল, তোরা আসলে কেন এসেছিস ?'

জাহিদ লোপার পাশে বসে, 'ওই যে রোহিত বলল, দু দিন তোকে দেখিনি।'

'আর কিছু ?'

'আর কী...।'

জাহিদকে বাধা দেয় রোহিত, 'না, আরেকটা কারণ আছে।'

'কী ?' লোপা আগ্রহী চোখে জাহিদের দিকে তাকায়।

'আপাতত বলা যাবে না।'

'কাল তোদের নিয়ে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেছি।' লোপা হাসতে হাসতে বলে, 'দেখি, তোরা পাঁচজন মিলে আমাকে ছাদ থেকে ফেলে দিচ্ছিস।'

শোয়েব একটু ঝুঁকে আসে লোপার দিকে 'তারপর ?'

'তারপর আবার কী ?'

'তুই ছাদ থেকে পড়ে মরে যাসনি ?' জাহিদ বলে।

'কী জানি, কাল রাতের কথা তো, মনে নেই।' খিলখিল করে হেসে ওঠে লোপা, 'আচ্ছা, তোরা কোনো স্বপ্ন দেখিস না ?'

'দেখি।' রোহিত ছলছল চোখে লোপার দিকে তাকায়, 'আমাদের স্বপ্নগুলো হচ্ছে ছোটবেলায় খেলা করা বালির ঘরের মতো— এই গড়া, এই ভেঙে যাওয়া।'

'স্বপ্ন গড়া আর স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার মধ্যে একটা ভাঙাগড়ার সুখ আছে। প্রত্যাশা আর প্রত্যাখ্যানের মধ্যে একটা ছন্দ থাকে, কিন্তু যার স্বপ্ন একেবারে ভেঙে যায়, তার কী হয় রে, বেঁচে থাকার সাত্ব সে কোথায় পায় ?'

'কোনো মানুষের স্বপ্ন একেবারে ভেঙে যায় না, স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পরও আরেকটা স্বপ্ন এসে সামনে দাঁড়ায়। আসলে মানুষ বিচিত্র ধরনের স্বপ্ন দেখে। ধানমন্ডিতে আমি যে ছাত্রীটিকে পড়াই— তার স্বপ্ন, সে খুব সাধারণ একটা ছেলেকে বিয়ে করবে, অথচ তার ঘরের দেয়ালে শোভা পায় টম ক্রুজ, রিচার্ড মার্কসের ছবি; তার বিয়ের শাড়ি নাকি হবে সিম্পলি তাঁতের, অথচ তার ওয়ারড্রোব বোঝাই করা আছে দেশের বাইরের দামি দামি শাড়িতে। বনানীর ছাত্রীটি প্রতিনিয়ত তার বন্ধু বদলায়, কিন্তু সে স্বপ্ন দেখে দেশের মানুষ একদিন স্থির এবং শান্ত হবে। আমার মতো মধ্যবিত্ত আদম সন্তানকে সে ডিপেস্ট ফিলিংস বোঝায়, হার্টবিটের সংজ্ঞা শেখায়।'

জাহিদ কী যেন একটা বলতে নেয়, কিন্তু তার আগেই মোবাইলটা বেজে ওঠে ওর। কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বাটনটা চেপেই মুখটা হাসি হাসি করে ফেলে, 'হ্যালো মুমু, কী খবর ?'

'ভালো, তুমি কোথায় এখন ?'

'আমি ?' জাহিদ লোপার দিকে একবার তাকিয়ে মাথাটা নিচু করে ফেলে, 'কেন, বাসায় ?'

'কি করছো ?'

'তেমন কিছু না। গতকাল খাঁটি সেগুন কাঠের একটা ডাবল খাট কিনেছি, এখন তার ওপর বসে বসে তোমার কথা ভাবছি।'

'কী পরে আছো তুমি এখন ?'

'মজার একটা জিনিস পড়ে আছি মুমু। তোমাকে তো বলা হয়নি, লন্ডনে আমার এক বন্ধু থাকে না, ওই যে কালো করে বন্ধুটা। ও, তুমি তো আবার ওকে দেখোনি।'

'আমি তো তোমার কোনো বন্ধুকেই দেখিনি। আচ্ছা ঠিক আছে, কী হয়েছে তোমার সেই বন্ধুর ?'

'ওর কিছু হয়নি। ও আমার অন্য এক বন্ধুর মাধ্যমে একটা হেভি ড্রেস পাঠিয়েছে, যা সুন্দর না মুমু! আমি এখন সেটা পরে আছি, আর তোমার কথা ভাবছি। ইস্! তুমি যদি এখন কাছে থাকতে!'

'আজ না থাকতে পারি, কাল তো থাকছি।'

কিছুটা চমকে ওঠে জাহিদ, 'কেন ?'

'বা রে, তুমি জানো না কিছু ?'

'না তো!'

'কাল তো আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার দিন।'

'বলো কি!'

'কেন ?'

'আগে বলবে না তুমি ব্যাপারটা! আমি কাল সকালে চিটাগাংয়ে যাবো। আমার এক বন্ধু এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে, ওর একটা কাজে কাল চিটাগাং যেতে হবে এবং তিন দিন থাকতে হবে। মনটা খারাপ করে দিলে সুইট।'

'কেন কেন ?'

'আমাদের প্রথম দেখা হওয়ার দিন, আর আমি থাকবো না তোমার পাশে, এটা কেমন দেখায়।'

'না না, ঠিক আছে, তোমার কাজ আছে না!'

'যতই কাজ থাক, এ দিনে তোমার জন্য বড় একটা গিফট কিনবো, তোমার বাসায় যাবো, তারপর তোমাকে নিয়ে বাইরে বের হয়ে কোনো ভালো হোটেলে খাবো, তারপর বেশ কিছুক্ষণ ইয়েলো ক্যাব নিয়ে ঘুরবো, কিন্তু...।' জাহিদ মুখ দিয়ে চুক চুক একটা শব্দ করে আফসোসের ভঙ্গিতে বলে, 'ব্যাপারটা কেমন হয়ে গেল না ?'

'না না, ঠিক আছে। তোমার কাজ আছে না!'

'থ্যাংকু মুমু। তুমি সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারো, কেবল...।'

'কেবল ?'

'না না কিছু না। তোমাকে অগ্রিম শুভেচ্ছা— হ্যাপি সুইট ডে মুমু, হ্যাপি সুইট মাই সুইট হার্ট।'

মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে জাহিদ, 'এক গ্লাস পানি খাওয়াবি লোপা ?'

অবাক চোখে লোপা তাকিয়ে আছে জাহিদের দিকে। তা দেখে জাহিদ ইতস্তত একটা ভঙ্গিতে বলে, 'কী দেখছিস অমন করে ?'

'তুই কীভাবে এতো মিথ্যে বলতে পারিস ?' রোবটের মতো কথাটা বলে লোপা।

'কীভাবে পারি ?' প্রশ্নটা যেন জাহিদ নিজেকেই করে, তারপর মাথাটা নিচু করে বলে, 'আমি নিজেও জানি না। কেবল জানি, এক উচ্চবিত্ত কন্যার সঙ্গে এই আমার নিম্নবিত্তের কোনো মিশ্রণ কখনোই সম্ভব নয়, বলতে পারিস মিশ্রণ দূষণীয়। তাই এমন করি। ও জানে না, আমার আর ওর মাঝে এক সমুদ্র পার্থক্য।'

'তাহলে সেই সত্য কথাটা বলছিস না কেন ?'

'কী জানি, কেন বলছি না। হয়তো তাই পালিয়ে বেড়াই।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় লোপা, 'বল, কী খাবি তোরা ?'

'কিছু না।' শোয়েবও উঠে দাঁড়ায়।

'কেন ?' লোপা কিছুটা রেগে বলে, 'বল, চা দেব না কফি ? না কোল্ড ড্রিঙ্কস ?'

'তিনটেই দিতে পারিস।' রোহিত লোপার দিকে তাকায়, 'আমাদের এই কেবল চা খাওয়া মুখে আজ চা, কফি, কোল্ড ড্রিঙ্কস একসঙ্গে মিশিয়ে খাবো।'

'তাহলে আমার সঙ্গে কেউ একজন কিচেনে চল।'

'কেন ?' জাহিদও উঠে দাঁড়ায়, 'তোদের কাজের মেয়ে নেই!'

'না।'

'ঠিকা কিংবা পারমানেন্ট কোনো কাজের লোকও নেই ?'

'না।'

'কেন ?'

'সেটা তো আমি জানি না, সেটা জানে মা, তার আগে জানে বাবা।'

'তুই এসব কী বলছিস!'

করুণ চোখে লোপা ওদের দিকে তাকায়। ওর আর কিছু বলার নেই।

খুব অলস ভঙ্গিতে কার্পেট থেকে উঠে দাঁড়ায় রোহিত। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে লোপার একেবারে সামনে দাঁড়ায়, 'আজ এখানে চা, কফি কিংবা কোল্ড ড্রিঙ্কস কোনোটাই খাবো না, আজ আমরা বাইরে খাবো।'

কিছুটা আশ্চর্য হয়ে লোপা বলে, 'কেন ?'

প্যান্টের পকেট থেকে একটা বেলী ফুল বের করে লোপার সামনে মেলে ধরে রোহিত, 'হ্যাপি বার্থডে লোপা।'

সঙ্গে সঙ্গে কপালটা কুঁচকে ফেলে লোপা, 'মানে ?'

'মানে, আজ তোর জন্মদিন।'

'তোরা এটা জানলি কীভাবে ?'

'কীভাবে জানি ?' জাহিদ আর শোয়েবের দিকে একবার তাকিয়ে রোহিত আবার ফিরে তাকায় লোপার দিকে, 'কী জানি! তুই আমাদের বন্ধু তো, হয়তো সে জন্যই জানি।'

টলটল করছে লোপার চোখ দুটো, যেন একটু টোকা লাগলেই গড়িয়ে পড়বে জলগুলো। কী নিশ্চিত একটা জীবন লোপার, কী সুখ, কী ক্ষমতা! আজকের এই দিনটায় ওর অনেক হেসে বেড়ানোর কথা, অথচ ও কাঁদছে।

চোখ দুটো মুছতে মুছতে লোপা ওদের দিকে তাকায়, তারপর শোয়েবের একেবারে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলে,

মনেরে আজ কহো যে
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যরে লও সহজে।

আচ্ছা বল তো শোয়েব, জীবনের সব সত্যকে কি সহজে বরণ করা যায়, সব সত্যকে কি মেনে নেওয়া যায় সহজে ?'

না, লোপার চোখ দুটো এখন আর টলটল করছে না, টলটলে জলগুলো এখন গড়িয়ে পড়ছে। ঘরের কোনায় একটা টিকটিকি হঠাৎ করে ডেকে ওঠে— টিক্ টিক্।

টুনির মুখের দিকে বোকার মতো তাকায় টুসী, যেন টুনি যা বলেছে তা বুঝতে পারেনি সে। পুরো তিন সেকেন্ড একভাবে তাকিয়ে থেকে শেষে চোখ দুটো বড় বড় করে রাগী গলায় বলে, 'কী বললি ?'

কিছুটা অবাক হয়ে টুনি বলে, 'কই, কিছু বলিনি তো!'

'কিছু বলিসনি ?'

'আপু–।' মুখ টিপে হাসতে থাকে টুনি, 'তুমি ইদানীং বাতাস থেকেই কথা শুনতে পাও।'

টুসী আরো রেগে যায়, 'ঘরে ঢুকেছিস কেন ?'

'একটা কথা বলার জন্য।'

'তোদের না বলেছি, চোরের মতো ঘরে ঢুকবি না, শব্দ করে ঘরে ঢুকবি ?'

'আপু, দু রকম কথা বলো কেন তুমি ?'

'দু রকম কথা বললাম মানে ?'

টুনি আরো একটু সামনে এগিয়ে আসে, 'শব্দ করে ঘরে ঢুকলে বলো, শব্দ করলি কেন; আবার চুপচাপ ঢুকলে বলো, চোরের মতো ঢুকলি কেন ?'

'কী কথা বলতে এসেছিস, বল।'

'ভয়ে ভয়ে বলবো, নাকি ভয় না পেয়ে বলবো ?'

'এই ছেমরি, এতো ঢঙ করছিস কেন, থাপ্পড় দিয়ে দাঁত ফেলে দেবো।'

'আপু, তুমি যে কী না, থাপ্পড় দিয়ে তুমি আমার দাঁত ফেলতে পারবে ? হাতে ব্যথা পাবে না ?'

'টুনি, আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাচ্ছি।'

'আপু, তুমি তো সব সময়ই রাগো।' টুনি আরো একটু এগিয়ে এসে বলে, 'ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।'

'কথাটা বললি না ?'

'তুমি যেভাবে রেগে আছো, বলতে ভয় পাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, নির্ভয়ে বল।'

'মারুফ ভাইয়া এসেছে।'

'কী!'

'বললাম তো মারুফ ভাইয়া এসেছে।'

'মারুফ ভাইয়া আবার কে ?'

'ওই উপরতলার চশমাওয়ালা ভাইয়াটা।'

টুসী একটু সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'আমার কাছে কী চায় ?'

'আমি কী জানি।'

'বল বাসায় নেই।'

'বলেছি।'

'শুনে কী বলে ?'

'আপু–।' টুনি মুখটা দুঃখী দুঃখী করে বলে, 'একটু দেখা করলে কী হয় ?'

মাথা নিচু করে পত্রিকা দেখছিল টুসী, মাথা তুলে সরাসরি টুনির চোখের দিকে তাকায়, 'কেন দেখা করবো ?'

'বাসায় কেউ দেখা করতে এলে দেখা করতে হয় না ?'

'না, সবার সঙ্গে দেখা করতে হয় না।'

'আমি এখন কী করবো ?'

'কী করবি মানে!' টুসী শব্দ করে বলে, 'ওই গাধাটাকে চলে যেতে বল। আর বল, আমি বাসায় নেই।'

'বলেছি তো। কিন্তু মারুফ ভাইয়া বলে, তোমাকে নাকি কিছুক্ষণ আগে বাসায় ঢুকতে দেখেছে।'

'তবু বল আমি বাসায় নেই।'

'বলেছি, কিন্তু যায় না।'

'না গেলে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দে।'

'আপু, এটা তুমি কী বললে ?'

'কেন ?'

'মারুফ ভাইয়া অনেক বড় না, ওনার ঘাড়ও তো অনেক উঁচুতে, আমি ধরবো কীভাবে ?'

পাশের ঘরে এসেই টুনি একটা চেয়ার এনে তার ওপর দাঁড়ায়। তারপর ডান হাতটা উঁচু করে ঘাড় ধরে ধাক্কা দেওয়ার ভঙ্গিতে প্র্যাকটিস করতে থাকে। বেডরুম থেকে দৃশ্যটা দেখেই সোমা চৌধুরী এগিয়ে যান টুনির দিকে, 'এসব কী করছিস!'

'প্র্যাকটিস করছি।'

'কিসের প্র্যাকটিস ?'

'ঘাড় ধাক্কা দেওয়ার।'

'কাকে ঘাড় ধাক্কা দিবি তুই ?'

'আপাতত বলা যাবে না।'

'কেন ?'

'আহ্ মা, বিরক্ত কোরো না তো!

সোমা চৌধুরী রাগে গরগর করতে করতে আবার নিজের রুমে চলে যান। টুনিকে ড্রইংরুমে ঢুকতে দেখেই মারুফ কিছুটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, 'কী হলো টুনি ?'

টুনি এগিয়ে গিয়ে মারুফের একটা হাত ধরে বলে, 'ভাইয়া, বসুন তো, দারুণ একটা কথা আছে আপনার জন্য।'

মারুফ বসতে বসতে বলে, 'বলো।'

'আমি তো আপুর রুমে ঢুকেই বললাম, আপু, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

'তারপর কী বললো টুসী ?' মারুফ একটু সোজা হয়ে বসে।

'আপু শুয়ে ছিল। আমার কথাটা শুনেই আপু উঠে বসলো। আপনার জন্য ভালো, কারণ আপু উঠে বসেছে। আর আপু যখন শুয়ে থাকে তখন কথা বললে খুব রাগ করে।' টুনি মারুফের পাশে বসা টোটনের দিকে তাকায়, 'তাই না রে টোটন ?'

'হ্যাঁ। একদিন হয়েছে কি জানেন ভাইয়া– ?' টোটন সোজা হয়ে বসে, 'আপু ঘুমিয়ে ছিল...।'

টোটনকে বাধা দেয় টুনি, 'তুই কি সেই ঘটনা বলতে চাইছিস ?'

'হ্যাঁ, ওই সেদিন, আপু...।'

হাত দিয়ে ইশারা করে টোটনকে আবার থামিয়ে দেয় টুনি, 'না, ওটা বলার দরকার নেই, মারুফ ভাইয়া লজ্জা পাবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে।' মারুফ টুনির দিকে তাকিয়ে বলে, 'টুসীর কথা বলো।'

'আমার কথা শুনেই আপু বলল, বল। আমি বললাম, মারুফ ভাইয়া এসেছে, তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'তারপর ?' মারুফ ঝুঁকে আসে টুনির দিকে, 'টুসী কী বলল ?'

'আপনার কথা শুনে আপু যা লজ্জা পেয়েছে না! দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলে, যাহ্। ওনার নাম শুনলেই সেদিনের স্বপ্নের কথা মনে পড়ে।'

'কোন স্বপ্ন ?' মারুফ খুব আনন্দ নিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'ওই সেদিন আমি আর টুসী যে একসঙ্গে ঘুরেছি আর অনেক কিছু খেয়েছি, ওই স্বপ্নটা ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ?' মারুফ চশমাটা খুলে গেঞ্জির নিচের অংশ দিয়ে পরিষ্কার করে আবার চোখে পরে, 'বলো বলো।'

'আপু বলে, ওনার সামনে গিয়ে আমি কী বলবো ? কিন্তু ওনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

'সত্যি ?' খুশিতে গদ গদ হয়ে মারুফ চশমাটা আবার খুলে দেখে, আবার পরিষ্কার করতে থাকে, 'কখন বলবে কথাগুলো ?'

'সেটাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে।' টুনি মারুফের একটা হাত ধরে, 'আপনার সময় হবে কখন ?'

হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করতে করতে মারুফ বলে, 'এখনই সময় হবে, আমি তো রেডি।'

'আপু যে এখন পারবে না, আপু এখন ঘুমাবে তো!'

'তাহলে কালকে ?'

'ঠিক আছে, আপুকে বলবো।' টুনি একটু থেমেই বলে, 'কাল কখন ?'

'তোমার আপু যখন সময় দেবে তখনই।'

'তাহলে আপুর কাছে শুনে আপনাকে জানাবো।'

টুনিদের বাসা থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকেই আবার বাইরে বের হয় মারুফ। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় টুনিদের বাসার দিকে। কিন্তু টুনিদের কলবেলে চাপ দিতে গিয়েও দেয় না। ফিরে আসে নিজের রুমে। একটু পর আবার টুনিদের বাসার দিকে পা বাড়ায়। কলবেলে চাপ দিতে যাবে, ঠিক তখনই দরজা খুলে বেরিয়ে আসে টুসী। মারুফকে দেখেই কপাল কুঁচকে ফেলে সে, 'আপনি!'

'আমি মারুফ।' কিছুটা গদগদ হয়ে কথাটা বলে মারুফ, 'আর আপনি তো টুসী ?'

'আপনার কি এখন ঘাড় ব্যথা করছে ?'

'জি ?'

'আমি বলছি, আপনার কি ঘাড় ব্যথা করছে ?'

'আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না।'

'টুনি আপনাকে...।'

কথাটা শেষ করতে পারে না টুসী, তার আগেই মারুফ বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, টুনির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'ও, আচ্ছা।' টুসী মারুফের দিকে গভীর চোখে একবার তাকিয়ে গট্ গট্ করতে করতে নেমে যায় নিচের দিকে।

বাসার বাইরে পা রেখেই কিছুটা থমকে দাঁড়ায় টুসী। না, আজও নেই। বুকের ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা হয়ে যায় মুহূর্তেই, অবসন্ন হয়ে যায় সমস্ত শরীরটাও। ক্লান্ত চোখে দুঃখী দুঃখী মুখে চারপাশটা একবার দেখে নেয় সে। আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও ফেরে সবকিছু। না, কেউ নেই। তার জন্য কেউ প্রতীক্ষা করে নেই, অধীর আগ্রহ নিয়ে কেউ চেয়ে নেই তার অপেক্ষায়।

কিছুক্ষণ সেভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন ভাবে টুসী। তারপর ভার্সিটির দিকে পা না বাড়িয়ে ফিরে আসে বাসায়। নিজের ঘরে গিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকে খাটের ওপর। কিছুই ভালো লাগছে না।

'আপু, আসব ?' ভয় ভয় চেহারায় টুনি তাকায় টুসীর দিকে।

মাথা তুলে তাকায় টুসী এবং মুখে সামান্য হাসি এনে বলে, 'আয়।'

কপালটা কুঁচকে ফেলে টুনি সঙ্গে সঙ্গেই। কিছুটা অবিশ্বাস্য স্বরে সে বলে, 'আসব ?'

মুখটা আবার হাসি হাসি করে টুসী, 'আয়।'

দ্বিধাগ্রস্ত পায়ে টুনি এগিয়ে গিয়ে একেবারে টুসীর সামনে এসে দাঁড়ায়, 'ফিরে এলে যে! ভার্সিটিতে যাবে না ?'

'ভালো লাগছে না।'

'কেন ?'

টুসী আগের মতোই সামান্য হেসে বলে, 'জানি না। মা কোথায় রে ?'

'পাশের বাসায় গেছে।'

'টোটন ?'

'কম্পিউটারে গেমস খেলছে।'

টুসী বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায়। নিচের ঠোঁট দুটো কামড়াতে কামড়াতে কী যেন ভাবে। তারপর বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই টুনি বলে, 'আবার কোথায় যাচ্ছো আপু ?'

'ভার্সিটিতে।'

'তুমি না বললে, ভালো লাগছে না ?'

'ইম্পর্টেন্ট একটা ক্লাস আছে।'

বাসার বাইরে এসে আবার চারপাশটা দেখে নেয় টুসী, এখনো কেউ নেই। কিছুক্ষণ তবু দাঁড়িয়ে থাকে সে। শেষে একটা রিকশায় বসে ভার্সিটির দিকে এগিয়ে যায়। জীবনের এই প্রথম রিকশার হুড তোলেনি টুসী, হুডটা ফেলে সারা রাস্তায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাকে যেন খোঁজে। কিন্তু পায় না। দুঃখী দুঃখী মুখ নিয়ে সে ক্লাসে যায়, কিন্তু ক্লাসে মন বসে না, ক্যাম্পাসে আড্ডা দিতে যায়, আড্ডাও ভালো লাগে না। প্রিয় কফি মনে হয় বিস্বাদ, সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো।

ক্যাম্পাসের ঘাস থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গেটের দিকে এগিয়ে যায় টুসী। দূর থেকে তাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখায়। কেমন যেন কিছুটা দুলে দুলে হাঁটছে সে।

ভার্সিটির গেটের কাছে এসে বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে আবার চারপাশটা দেখে নেয় টুসী। না, এখানে নেই, কেউ নেই। চারদিকে কেবল শূন্যতা আর শূন্যতা।

বাস আসে একটা, আবার চলেও যায়, কিন্তু টুসী দাঁড়িয়ে থাকে আগের মতোই। বাস স্টপেজে সে এখন একা। মাথার ভেতর অনেক চিন্তার সুতো জট পাকিয়ে যাচ্ছে, জটটা সে ছাড়াতে চাইছে, জট তো ছাড়ছেই না, আরো জড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

'টুসী, কেমন আছেন ?'

ঝট করে টুসী পাশ ফিরে তাকায়। না, কেউ নেই। একরাশ বাতাস এসে কেবল তার মাথার চুলগুলো ছুঁয়ে যায়।

'আপা, ফুল নিবেন ?'

ছোট্ট একটা মেয়ে কয়েকটা দোলনচাঁপা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। টুসী অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে মেয়েটির দিকে— আচ্ছা, আসলে কে সুখী— সে, না এই ছোট্ট মেয়েটা ? দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়— সে নয়, এই ছোট্ট মেয়েটাই সুখী। ফুলগুলো নিয়ে টাকা দিতেই মেয়েটা প্রায় লাফাতে লাফাতে দৌড়ে চলে যায়।

'টুসী, কেমন আছেন ?'

চোখ দুটো সামান্যক্ষণের জন্য বুজে টুসী স্থির হয়ে মনে মনে বলে— না, সে আর পাশ ফিরে তাকাবে না। সে তাকায় না।

'টুসী, কেমন আছেন ?'

আবার চোখ বুজে ফেলে টুসী, আবার মনে মনে বলে— না, সে পাশ ফিরে তাকাবে না। তাকায়ও না সে।

'টুসী, আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ?'

টুসী সঙ্গে সঙ্গে বিড়বিড় করে, 'না, আমি কারো কথা শুনতে পাচ্ছি না।'

'এই টুসী!' মৃদুল টুসীর একেবারে কাছ ঘেঁষে সামনে এসে দাঁড়ায়, 'বিড়বিড় করে কী বলছেন ?'

চোখ দুটো এতক্ষণ বুজেই ছিল টুসী। খুব কাছ থেকে কথাটা শুনে সে আলতো করে চোখ মেলে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাস বন্ধ করে ফেললো টুসী। এ মুহূর্তে সে কিছুই বুঝতে পারছে না, দেখতেও পাচ্ছে না কিছু। কেবল শুনতে পাচ্ছে শ্বাস আর প্রশ্বাস। নিজের বুকের ভেতর বয়ে চলা রক্তনালি কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে, কেঁপে ওঠে ঠোঁট দুটো, কানের কাছে গুনগুন করতে থাকে— সে এসেছে, সে এসেছে।

চোখের মণি দুটো স্থির করে টুসী মৃদুলের দিকে তাকায়, 'আপনি মানুষ নন।'

'সত্য।' হাসি হাসি মুখ করে মৃদুল বলে, 'মানুষ আমি কোনো কালেই ছিলাম না।'

'মন নিয়ে বেশ খেলতে পারেন মৃদুল, বেশ খেলতে পারেন।'

'সাধারণত যে কোনো খেলা খেলতে হলে তো অন্তত দুটো মানুষ লাগে, আমি তো একা।'

স্থির চোখ দুটো আরো স্থির করে ছোট্ট করে একটা প্রশ্ন করে টুসী, 'আপনি একা ?'

'আমার সকালটা বিবর্ণ পড়ে থাকে চুপচাপ, জানালায় দোয়েলের ডাককে তেমন মধুর মনে হয় না, বইয়ের পাতা ওল্টানোর কষ্টটাও ভীষণ কাহিল করে ফেলে, কোথাও কোনো সবুজ দেখি না, কেবল ধূসর মনে হয় সবকিছু। মনে হয় আমি যেন ঝরা পাতা, মরে আছি, পড়ে আছি। কারণ আমার প্রিয় মানুষটা আমাকে জড়িয়ে ধরে নয়, হাতে হাত রেখেও নয়, এমনকি কানের কাছে মুখ এনেও ফিসফিস করে বলেনি— আমি তোমাকে ভালোবাসি প্রিয়, ভালোবাসি, ভালোবাসি।'

মুগ্ধ বিস্ময়ে মৃদুলের দিকে তাকায় টুসী। সাধারণ একটা ছেলে, কিন্তু কী অসাধারণ লাগছে এ মুহূর্তে। চোখ দুটো মাটির দিকে নামায় টুসী, 'আমি বলেছি।'

'কখন, কোথায়, কীভাবে ?'

'কখন— যখন ভালোবেসে ফেলেছি, তখন; কোথায়— বইয়ের পাতায়, রাস্তায়, ঘরের জানালায়, পাতাবাহারের পাতায়, আকাশের চাঁদে, তারায়; কীভাবে— হৃদয় দিয়ে, হৃদয়ের গভীর মমতা দিয়ে, প্রগাঢ় অনুভবের স্পর্শ দিয়ে।' টুসী একবারের জন্য মৃদুলের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার নিচের দিকে তাকিয়ে বলে, 'যতোবার তোমায় ভালোবেসেছি, ততোবার তোমায় প্রশ্ন করেছি— তোমার বুকে কি ঘাস আছে ? ওখানে আমার বসতবাড়ি, যতো

অগোছালো আগাছা নিড়াব আমি। হঠাৎ বুকের মাঝ থেকে উড়ে যাওয়ার সাধ হয়, আকাশ ছুঁয়ে ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে হয়, তারপর তোমার রুক্ষ বুকে আমার কপাল রাখি— তুমি কি শিউরে ওঠো ?' টুসী হাসতে হাসতে বলে, 'একটা কবিতা বললাম, কী বুঝলেন ?'

চমকে ওঠে মৃদুল— বলে কি মেয়েটা!

ভালো করে তাকিয়ে দেখে, চোখ দুটো ভিজে উঠেছে টুসীর, চিকচিকে জল জমেছে চোখে।

বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপছে এখন, হাতের তালু দুটো কেমন যেন ঘেমে ঘেমে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হলো পা দুটো টলে উঠছে মাঝে মাঝে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে মৃদুল। তারপর বেশ দূরাগত গলায় বলে, 'টুসী...।'

হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে থামিয়ে দেয় টুসী। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে শেষে বলে, 'আজ যাই।'

'একা ?' ঠোঁটের কোনায় হাসি আনে মৃদুল, 'আমি যাবো না ?'

নিঃশব্দে হাঁটছে ওরা। কোনো কথা নয়, শুধু অনুভব। মাঝে মাঝে বাতাস এসে ছুঁয়ে যায় দুজনকেই।

'ভালোবাসার প্রথম শর্ত কী, জানো ?'

'বিশ্বাস।' ছোট্ট করে উত্তর দেয় টুসী।

'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো ?'

'ভালোবাসি যে।'

'তাহলে তোমাকে একটা অনুরোধ করবো আজ। এই প্রথম এই শেষ।'

'বলো।'

'আমি কোথায় থাকি, সেটা কি দেখবে ?'

'কবে ?'

'আজ, এক্ষুণি।'

মৃদুলের দিকে একবার গভীরভাবে তাকিয়ে টুসী বলে, 'দেখবো।'

শঙ্কিত পায়ে মৃদুলদের ঘরে ঢুকেই টুসী ম্লান হেসে বলে, 'ব্যাচেলরদের রুম এতো গোছানো হয় নাকি!'

'সাধারণত হয় না। কিন্তু তুমি আজ আসবে বলে হয়তো হয়েছে।'

মেঝের ওপর পাতা বিছানায় পা তুলে বসতে বসতে পাশের ঘরের দিকে তাকায় টুসী, 'আর কে কে থাকে এখানে ?'

'আমার আরো কজন বন্ধু থাকে।'

'অ।'

টুসীর ঠিক সামনে বসে মৃদুল মাথাটা নিচু করে ফেলে। কিছুক্ষণ সেভাবে বসে থেকে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে টুসীর দিকে সরাসরি তাকায় সে, 'তোমাকে আজ কিছু প্রশ্ন করবো আমি।'

চোখ দুটো কুঁচকে ফেলে টুসী, 'প্রশ্ন!'

'হ্যাঁ। আর আমি আশা রাখি প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক জবাব দেবে তুমি।'

পা দুটো আরো গুটিয়ে নিয়ে আরো গুছিয়ে বসে টুসী, 'ওকে, তোমার প্রশ্ন বলো।'

'ভালোবাসার সৃষ্টি হয় কোথা থেকে, জানো ?'

'বুকের ভেতর থেকে।'

'হ্যাঁ, বুকের ভেতর থেকেই সবার ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। তাই তোমার জন্য আমার যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছে, তা আমার বুকের ভেতর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। তাই না ?'

'তাই তো।' ঠোঁট দুটো চেপে হাসতে থাকে টুসী।

'ধরো, তোমার জন্য যদি অন্য কারো ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, সে ভালোবাসাও কিন্তু তার বুকের ভেতর থেকেই সৃষ্টি হবে। ঠিক ?'

'ঠিক।'

'সুতরাং তোমার কাছে আমি যেমন, অন্য কেউ যদি তোমাকে ভালোবাসে, সেও তোমার কাছে একই হওয়া উচিত। ঠিক না ?'

টুসী কিছুটা শব্দ করে বলে, 'মানে ?'

'একটা মানুষ তোমাকে নিঃসীম ভালোবাসে, ভালোবেসে সে মানুষটা নিজেকে ভুলে গেছে, যার অস্তিত্বে, চিন্তায়, মননে কেবল তুমি। তুমি জানো সে মানুষটা কে ?'

'তুমি এসব কী বলছো মৃদুল! কে আমাকে ভালোবাসে, কে ?'

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ায় মৃদুল, তারপর পাশের ঘরের দিকে তাকায়, 'রোহিত, রেজাকে নিয়ে একটু আসবি ?'

রেজার কাঁধে হাত রেখে রোহিত এ ঘরে ঢোকে, পেছনে জাহিদ আর শোয়েব। মাথা নিচু করে আছে রেজা, মৃদুল ওর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'ওকে চিনতে পারছো টুসী ? এই ভালোবাসার পাগল ছেলেটাই তোমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে, একদিন সে ভালোবাসার কথা তোমাকে বলেওছিল, কিন্তু তুমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে ঘৃণাভরে, সেদিন সারা রাত ও কেঁদেছে। টুসী, তুমি কি জানো প্রত্যাখ্যানের কষ্ট কতো প্রখর, কতো জ্বলন্ত!'

মৃদুল টুসীর দিকে সরাসরি তাকায়। মাথা নিচু করে আছে টুসী, কিছু বলে না সে।

'সেদিন আমিও কেঁদেছি, একজন বন্ধুর কষ্টে কেঁদেছি, একজন মানুষের কষ্টে কেঁদেছি। রেজাকে সেদিন তাই বলেছিলাম, আমি একদিন তোমার

ভালোবাসা আদায় করবো, তারপর আমি আমার আসল কাজটা করবো।' মৃদুল একটু এগিয়ে আসে টুসীর দিকে, 'টুসী, প্রিয় বন্ধু আমার, আমার আর রেজার ভেতরটার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আমি কেবল ওর জন্যই এতো দিন তোমাকে চেয়েছি, তোমাকে ভালোবেসেছি, তোমার পথে পথে গিয়েছি।' গভীর একটা নিঃশ্বাস নেয় মৃদুল, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো টুসী, কিন্তু...।' কিছুক্ষণের জন্য চোখ দুটো বুজে ফেলে মৃদুল, 'আমি তোমাকে বাসি না।' কাঁপা কাঁপা হয়ে যায় মৃদুলের কণ্ঠ, 'প্লিজ টুসী, তুমি ওর দিকে একটু তাকাও।'

টুসীর মনে হয়, মৃদুল নয়, অন্য কেউ বলছে কথাগুলো, যে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সমস্ত শরীর আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে আসে টুসীর, তিরতির করে কেঁপে ওঠে কপালের দুপাশটা।

মৃদুল ঘুরে দাঁড়িয়ে রেজার দিকে এগিয়ে যায়, 'মাথা নিচু করে আছিস কেন গাধা, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখ।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকায় রেজা এবং সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে বলে, 'এ কে ? এ তো সে মেয়ে না।'

চিৎকার করে ওঠে মৃদুলও, 'কী বলছিস তুই!'

রেজা একটু সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'আমি তো এর কথা বলিনি, ওই বিল্ডিংয়ে আরেকটা মেয়ে আছে না!'

চোখ দুটো বড় করে ফেলে মৃদুল।

রেজা খুব শান্তভাবে বলে, 'মৃদুল, তুই ভুল করেছিস।'

টুসী আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় এবং মৃদুলের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তার দিকে। মাথা নিচু করে ছিল মৃদুল, মুখ তুলে তাকায় ও। ভিজে গেছে টুসীর চোখ দুটো, মুক্তোদানার মতো টলটল করছে দু ফোঁটা জল, একটু একটু কাঁপছে ফোঁটা দুটো, যেন মৃদুলকে দেখে তারা হাসছে, প্রহসনের হাসি। টুসী ম্লান হেসে মৃদুলের একটা হাত নিজের হাতে আনে— কত কথা বলার ছিল, কত কিছু জানানোর ছিল। কিন্তু কিছু বলেও না, কিছু জানায়ও না। কেবল কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলে, 'থ্যাংকু মৃদুল, থ্যাংকু বন্ধু।'

চলে যাচ্ছে টুসী। মৃদুলের মনে হয়, একটু এগিয়ে যাবে টুসীর সঙ্গে। কিন্তু এগিয়ে যেতে গিয়েই দেখে পা দুটো তুলতে পারছে না, যেন অনন্তকাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে সে এখানে।

মৃদুল যা ভেবেছিল, ব্যাপারটা তা-ই হলো। বেশ কিছুক্ষণ শব্দ হওয়ার পর দরজা খুলেই দেখে লোপা দাঁড়িয়ে আছে। স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে সে তার দিকে। মৃদুল একটু এগিয়ে গিয়ে অবিশ্বাস্য স্বরে বলে, 'লোপা তুই! এতো রাতে ?'

মুখটা হাসি হাসি করে লোপা, 'গল্প করতে এলাম।'

'গল্প ? এতো রাতে!' মৃদুল আরো অবাক হয়ে যায়।

'কেন, গল্প করা যায় না রাতে ?' ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে লোপা বলে, 'গল্প করার মজাটাই তো রাতে। আচ্ছা, রাত কি খুব বেশি হয়েছে ?'

'আপাতদৃষ্টিতে বেশি হয়নি, কিন্তু যখন একটা মেয়ে জড়িত থাকে এর সঙ্গে, তখন বলতে হয় বেশিই হয়েছে।'

'হোক।' লোপা একটু সোজা হয়ে দাঁড়ায়, 'ভালোভাবে আমার দিকে একটু তাকা তো মৃদুল ?'

মৃদুল লোপার দিকে তাকায়।

'এবার বল তো, কেমন লাগছে আমাকে ?'

'তোকে তো কখনো শাড়ি পরতে দেখিনি, শাড়ি পরলে তোকে অসম্ভব সুন্দর লাগে।'

'সত্যি বলছিস, না মিথ্যে ?'

'তোর কী মনে হয় ?'

লোপা আবার হাসতে থাকে, 'সত্যি বলছিস।' মৃদুলের বিছানায় বসতে বসতে লোপা বলে, 'ওরা কোথায়, ঘুমিয়েছে নাকি ?'

'না।'

পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে লোপা বলে, 'রোহিত, তোরা কি একটু আসবি এ ঘরে ?'

কানে মোবাইল লাগিয়ে প্রথমে জাহিদ আসে, তারপর রোহিত। একটু পর চোখের সামনে গীতাঞ্জলি ধরে ঘরে ঢোকে শোয়েবও। কেবল রেজা আসে না।

'রেজা এলো না ?' লোপা জিজ্ঞেস করে।

'ওকে তো শুয়ে পড়তে দেখলাম।' জাহিদ বলে।

'ঘুমিয়েছে নাকি ?'

'সম্ভবত।'

'এতো তাড়াতাড়ি ঘুমালো, শরীর খারাপ নাকি ওর ?'

'শরীর খারাপ না।'

'তাহলে ?'

'মন খারাপ।'

'কেন ?'

'সে এক বিরাট ইতিহাস...।'

জাহিদকে থামিয়ে মৃদুল লোপার দিকে একটু সরে আসে, 'আচ্ছা, তোর মন খারাপ না তো ?'

'একদম না।'

'আজ হঠাৎ শাড়ি পরলি যে।'

'বা রে।' শাড়ির আঁচলটা একটু সামনে টেনে এনে লোপা বলে, 'পরতে ইচ্ছে করলে পরবো না!'

'হঠাৎ পরতে ইচ্ছে করলো ?'

কিছুটা রাগী চোখে লোপা মৃদুলের দিকে তাকায়, 'মানুষের অনেক কিছুই হঠাৎ করে হয়, এটা জানিস গাধা ?'

'জানি।' মৃদুল একটু থেমে বলে, 'সত্যি তোর মন খারাপ না তো ?'

'বললাম তো, না।'

'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আজ তোর মন খারাপ, ভীষণ রকমের খারাপ।'

মাথাটা নিচু করে কী যেন ভাবে লোপা। তারপর আস্তে আস্তে উঁচু করে মাথাটা দোলাতে দোলাতে বলে, 'একদম মন খারাপ না। অনেক ভালো আছে আজ মনটা। কারণ আমি আজ তোদের একটা গল্প বলবো, মজার গল্প।'

'তুই গল্প বলবি!' আশ্চর্য চোখে জাহিদ লোপার দিকে তাকায়।

'কেন, আমি গল্প বলতে পারি না ? আমার কোনো গল্প থাকতে পারে না ?'

'তা পারে। কিন্তু তোর কোনো মজার গল্প যে থাকতে পারে, এটা বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'সত্যি, আজ একটা মজার গল্প বলবো। গল্পটা শুনে হাসতে হাসতে তোদের কারো চোখে বন্যা বয়ে যাবে, কারো পেটও ফেটে যেতে পারে। কতো দিন আমি এ গল্প বলতে চেয়েছি তোদের, কিন্তু বলা হয়নি। বলতে পারিস বলার সুযোগ হয়নি।'

রেজা কিছুটা দুলতে দুলতে এ ঘরে আসতেই লোপা বলে, 'কিরে, ঘুম হচ্ছে না ?'

'হচ্ছে।'

'তাহলে উঠে এলি যে!'

'তোর মজার গল্প শুনতে এলাম।'

জাহিদের মোবাইলটা বেজে ওঠে। 'অ, মুমু। মুমু, মাই সুইট হার্ট। তুমি কি একটু পরে ফোন করতে পারবে ? কেন ? আর বোলো না, মৃদুলের হার্টের কী একটা

প্রবলেম হয়েছে, আমরা সবাই মিলে এখন ওর মাথায় পানি ঢালছি। হার্টের প্রবলেমের সঙ্গে মাথায় পানি ঢালার কী সম্পর্ক ? এই তো তুমি এবার আমাকে প্রবলেমে ফেললে, এটা তো আমি জানি না। না না, মৃদুলের সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না, ও শুয়ে থেকে ভীষণ কাতরাচ্ছে, আমরা ওকে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছি। ভীষণ কথা বলার ইচ্ছে করছে আমার সঙ্গে ? প্লিজ মুমু, আজ না, আমরা মৃদুলকে নিয়ে টেনশনে আছি। কাল কথা বলবো। হ্যাঁ, রাখি, বাই...।'

মোবাইলটা বন্ধ করতেই আবার বেজে ওঠে। জাহিদ রিসিভ বাটন চেপেই বলে, 'আবার কেন ?'

'জরুরি একটা কথা আছে।'

'জরুরি কথাটা কাল শুনি ? কারণ আমাদের এখানেও জরুরি অবস্থা চলছে মুমু, ভীষণ জরুরি।'

'কেন ?'

'ওই যে তোমাকে বললাম না, মৃদুলের হার্টের সমস্যা। কেমন যেন করছে ও। বোধহয় বাঁচবে না।'

'হঠাৎ করে মৃদুল ভাইয়ার হার্টের প্রবলেম হলো কেন ?'

'আর বোলো না। হার্ট নিয়ে এতো খেলাধুলা করলে হার্টের ওপর চাপ তো পড়বেই। আচ্ছা মুমু, এখন রাখি...।'

কথাটা শেষ হতেই মৃদুল জাহিদের পিঠে একটা ঘুসি দিয়ে বলে, 'তোর হবে, তবে রাজনীতিবিদ হলে সবচেয়ে ভালো করবি।'

'তোর হবে না ?'

'আমার আর হবে কী! আমার তো হার্টের সমস্যা, সে সমস্যার জন্য তুই এখন আমার মাথায় পানি ঢালছিস।' মৃদুল হাসতে থাকে।

মোবাইলটা আবার বেজে উঠতেই লোপা রেগে গিয়ে বলে, 'একদম মোবাইল বন্ধ। কোনো কথা বলতে পারবি না এখন মোবাইলে, আমি এখন গল্প বলবো।'

মোবাইলটা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়ে জাহিদ লোপার দিকে তাকায়, 'ওকে, লেট্স্ স্টার্ট।'

শোয়েবের গায়ে আঙুল দিয়ে একটা খোঁচা দেয় লোপা, 'শোয়েব, তুই এখন বই পড়বি, না গল্প শুনবি ? যদি বই পড়তে চাস, তাহলে পাশের ঘরে চলে যা। আর গল্প শুনতে চাইলে বইটা আপাতত রেখে দে, প্লিজ।'

শোয়েব বই রেখে দিতেই লোপা মৃদুলকে বলে, 'তোরা কি মনোযোগ দিয়ে গল্পটা শুনবি ?'

'শুনবো।' মৃদুল পা দুটো গুটিয়ে নিয়ে বলে, 'তার আগে একটা কথা। গল্পের মাঝে কি প্রশ্ন করা যাবে ?'

'যাবে। তবে উত্তর দেবো কি না সেটা আমার ব্যাপার। প্রশ্ন না করলেই বোধহয় ভালো হয়।' রেজার দিকে তাকায় লোপা, 'রেজা, তুই কিছু বলবি ?'

'না, আমি শুধু মজার একটা গল্প শুনতে চাই, খুব মজার।'

লোপা সবার দিকে একবার ফিরে তাকায়, তারপর নিচু করে ফেলে মাথাটা। একটু পর মাথাটা তুলে কিছুটা হেসে হেসে বলে, 'মেয়েটা তার বাবাকে খুন করবে। পুরো তিনটা কারণে খুনটা করার কথা ছিল তার, কিন্তু দুটা কারণ ভোলার চেষ্টা করেছে সে, কিছুটা ভুলেও গিয়েছে। বাকি একটা কারণে সবকিছু ভেবে সে এই সিদ্ধান্ত নেয়— খুনটা তাকে করতেই হবে, অবশ্যই করতে হবে।

খুন হতে যাওয়া বাবাটা মেয়েটার আসল বাবা নয়। মেয়েটাকে একটা এতিমখানা থেকে আনা হয়েছিল, কারণ বাবার কোনো সন্তান ছিল না। কারণ অবশ্য আরেকটা ছিল— কোনো সন্তান দত্তক নিলেই নাকি কয়েক বছরের মধ্যে স্ত্রীর পেটে সন্তান আসে। বাবার ভাগ্যে অবশ্য সেটা হয়নি। দত্তক নেওয়া বাবা-মা যেদিন জানতে পারেন ব্যাপারটা, যেদিন জানতে পারেন তারা সত্যি সত্যি কোনো দিন বাবা-মা হতে পারবেন না, সংসারের প্রতি উদাসীনতা আসে তাদের সেদিন থেকেই।

প্রতিদিন সকালে বাবা বাসা থেকে বের হয়ে যান তার ব্যবসার কাজে, মাও নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে। এদিকে পড়ে থাকে তাদের সংসার, পড়ে থাকে আশ্রয় পাওয়া মেয়েটা। সংসারের একগাদা কাজের মানুষের মাঝে বড় হতে থাকে সে তার মতো।

মেয়েটা বড় হতে হতে দেখে— তার বাবা ইদানীং নেশা করে ফেরেন বাসায়, মাও কেমন যেন এসব দেখেও দেখেন না। হঠাৎ একদিন কি-না-কি হয়ে যায়, বাসার সব কাজের মেয়েকে বিদায় করে দেন মা। মেয়েটা আরো একা হয়ে যায়, কারণ বাড়িতে কোনো মেয়ে নেই, শুধু সে ছাড়া। সব কাজের মানুষই ছেলে, তার মাও প্রায় সারা দিনই থাকেন বাইরে, ফেরেনও অনেক রাতে।

এতো একাকিত্বের মাঝে কোনো কোনো সময় তার একদম একা মনে হতো না, যখন বাবা তাকে কপালে চুমু খেতেন। বাবা প্রতিদিন যা-ই করতেন, এ কাজটা করতে ভুলতেন না— সকালে বাসা থেকে বের হওয়ার আগে বাবা মেয়েটার কপালে একটা চুমু খেতেন, রাতে বাসায় ফিরেও চুমু খেতেন। কী যে ভালো লাগতো মেয়েটার! বাবা, পরম মমতাময় বাবা!

মায়ের তুলনায় বাবা অবশ্য মেয়েটাকে একটু বেশিই ভালোবাসতেন। মেয়েটার যদি কোনো কিছুর ইচ্ছে হতো, বাবা সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ করার চেষ্টা করতেন। মেয়েটা আকাশ পছন্দ করত বলে বিশাল বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আকাশছোঁয়া একটা ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছিলেন বাবা তাকে, ফুল পছন্দ করত বলে ফুল আসত তার ঘরে নিয়মিত, গাড়ি-পোশাক-অলঙ্কারের কোনো কোনো নির্দিষ্ট দোকান ছিল তার জন্য সব সময়ই খোলা।

কিন্তু একদিন, একদিন রাতে সবকিছু পাল্টে যায়। মেয়েটা জ্যোৎস্না দেখে কাটিয়েছে সে রাত। জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে সে একসময় অবাক হয়ে খেয়াল করে— জ্যোৎস্নার আলোগুলো কেমন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে, আলোগুলো শিমুল তুলোর মতো উড়ে উড়ে যাচ্ছে, বাতাস বওয়া শীতের রাতের কুয়াশার মতো আলোগুলো ঢেউ ঢেউ হয়ে ভেসে যাচ্ছে এদিক থেকে সেদিক। এতো একাকিত্বের মাঝেও যে

একটু আনন্দ ছিল, সে জ্যোৎস্নাভাঙা রাতের পর উধাও হয়ে যায় তার আনন্দটাও। বাবা আর তাকে সকাল-রাতে কপালে চুমু খান না, এমনকি চোখ তুলে তাকানও না তার দিকে।

মেয়েটা প্রতিদিন আড়চোখে তার বাবাকে দেখে। দেখে— বাবা তাকে দেখলেই মাথাটা নিচু করে ফেলেন, তাকে দেখলেই কেমন যেন এড়িয়ে যান, পালাতে চান, দ্রুত আড়াল হতে চান তার চোখের সামনে থেকে।

প্রিয় বাবার এই পালিয়ে বেড়ানোর কষ্ট সে প্রতিদিন দেখে স্বয়ং বাবার চোখে, অপরাধীর ছায়া দেখে সে বাবার প্রতিদিনের অভিব্যক্তির মাঝে। বাবা কেমন যেন ন্যুব্জ হয়ে যান প্রতিদিন, কেমন যেন মুষড়ে পড়েন প্রতিক্ষণ, ক্রমেই বাবা দূরে চলে যান প্রতি মুহূর্তে।

বুক ভেঙে যায় মেয়েটার, তার কষ্টে নয়, বাবার কষ্টে। বাবা আর তাকে আদর করতে পারেন না, বাবা আর তাকে কাছে টেনে কথা বলতে পারেন না। বাবা তার দু চোখ এখন মেলতে পারেন না ইচ্ছেমতো, শব্দ করে নিঃশ্বাস নিতে পারেন না বুকভরে। বাবা থেমে গেছেন, বাবা নিশ্চুপ হয়ে গেছেন ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মতো। বাবাকে তাই খুন করতে হবে, খুন করে এই নিঃসীম কষ্ট থেকে বাবাকে মুক্তি দিতে হবে। বাবার অসীম কষ্ট!

কারণ জ্যোৎস্নাভাঙা এক গভীর রাতে বাবা একদিন মেয়েটার ঘরে গিয়েছিলেন।'

লোপা গল্প শেষ করে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মৃদুল লোপার দিকে তাকাতেই দেখে, মাথা নিচু করে ফেলেছে লোপা। কিছুক্ষণ পর মাথাটা উঁচু করেই সে হো-হো করে হাসতে হাসতে বলে, 'কী, খুব মজার একটা গল্প না ? খুব মজার, খুব মজার! আমি আজ সারা রাত এ গল্পটা বলে বেড়াবো মানুষকে, সারা শহরের মানুষকে বলে বেড়াবো।'

কথাটা বলেই লোপা একদম চুপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ সেভাবেই চুপ থেকে মৃদুলের একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'তোরা কি আজ আমাকে এই শহরটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবি ?

'এতো রাতে শহর দেখবি!' মৃদুল লোপার হাতটা নিজের হাতের ভেতর আনে, 'কেন ?'

'আজ আমি মানুষ দেখবো।'

'মানুষ দেখার কী হলো, কখনো মানুষ দেখিসনি ?'

'না।' ম্লান হাসার চেষ্টা করে লোপা, কিন্তু সারা চোখ ভিজে গেছে টলটলে পানিতে। পানিগুলো একসময় পড়তে থাকে। নিঃশব্দে পড়া সে পানি-চোখে লোপা খুব দুঃখী গলায় বলে, 'সত্যি সত্যি আমি এখন পর্যন্ত কোনো মানুষ দেখিনি রে!'